আধুনিক প্রাচ্যবাদের কবলে

হাসসান বিন সাবিত

আধুনিক প্রাচ্যবাদের কবলে

আধুনিক প্রাচ্যবাদের কবলে মুসলিম নারীসমাজ

লেখক
হাসসান বিন সাবিত

সম্পাদনা : কায়েস শরীফ
বানান-সমন্বয় : হুসাইন আহমাদ
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম। আম্মাবাদ,

১. 'প্রাচ্যবাদ' ইসলাম ও মুসলিমদের কাছে এক মূর্তিমান আতঙ্কের নাম। সূচনালগ্ন থেকেই প্রাচ্যবাদের প্রধান আকর্ষণ ও মনোযোগ ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি। খুঁজে খুঁজে ইসলামের খুঁত বের করাই তাদের অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। ইসলামি সভ্যতার খুঁত বের করার অলীক স্বপ্ন যখন ব্যর্থ হয়েছে, তখন প্রাচ্যবাদী সংস্থাগুলো ভিত্তিহীন অভিযোগের তির ইসলামের দিকে ছুড়ে মেরেছে এবং জনমনে মেরুদণ্ডহীন গালগল্প প্রচার করে বেড়িয়েছে। ইসলামের এমন কোনো দিক নেই, যে দিক নিয়ে প্রাচ্যবাদ ভ্রষ্টতা ছড়ায়নি কিংবা আতঙ্কের বোমা ফাটায়নি। ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি মিটিয়ে দিয়ে পশ্চিমের নোংরা সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পৃথিবী সয়লাব করার হীন এজেন্ডা বাস্তবায়নে প্রাচ্যবাদী সংস্থাগুলো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় বিশ্বব্যাপী ইউরোপ-আমেরিকার কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব বাস্তবায়নে যে কয়েকটি প্রাচ্যবাদী সংস্থা ধূর্ততার পরিচয় দিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো 'র‍্যান্ড কর্পোরেশন'। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ-আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ পলিসি মেকার হিসেবে 'র‍্যান্ড কর্পোরেশন'-এর যাত্রা শুরু হয়। যাত্রা শুরুর পর থেকেই র‍্যান্ড কর্পোরেশন অত্যন্ত চতুরতার সাথে

ও সুসংগঠিতভাবে পশ্চিমা-স্বার্থ বাস্তবায়নে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। এযাবৎকাল পর্যন্ত র‍্যান্ডের প্রত্যেকটা পদক্ষেপই ছিল চোখে পড়ার মতো। তা ছাড়া দুনিয়াব্যাপী পশ্চিমা-আদর্শ পাকাপোক্ত করণে র‍্যান্ড কর্পোরেশন প্রাচ্যবাদী অন্যান্য সংস্থাগুলোকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গেছে।

২. সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই বাতিলপন্থিরা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে 'নারীসমাজ'-কে তাদের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। ইসলামের বিরুদ্ধে জয়ধ্বনি তুলতে বরাবরই তারা নারীদেরকে লেলিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমা দাস র‍্যান্ড কর্পোরেশনও এর বাইরে গিয়ে উলটো পথে হাঁটেনি। তারাও ইসলামের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনে পূর্বসূরিদের অনুসরণ করে নারীসমাজকে ব্যবহার করেছে অত্যন্ত চতুরতার সাথে। কথিত নারী-অধিকার, নারী-স্বাধীনতা, নারীমুক্তি ইত্যাদি মুখরোচক স্লোগানের আড়ালে অত্যন্ত কৌশলে তারা প্রশ্ন তুলেছে ইসলামে নারীর অবস্থান নিয়ে। প্রোপাগান্ডার পর প্রোপাগান্ডা ছড়িয়েছে ইসলামের নারী-আইন বিষয়ে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, যা একইসঙ্গে আশ্চর্যেরও বটে, র‍্যান্ড কর্পোরেশন কর্তৃক সৃষ্ট এ সংকট মোকাবিলায় বিদেশি ভাষায় কমবেশ কিছু কাজ হলেও বাংলা ভাষায় র‍্যান্ড কর্পোরেশন ও তার অপতৎপরতা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো কাজ আমাদের চোখে পড়েনি। এ শূন্যতা পূরণে ও র‍্যান্ড কর্পোরেশনের অপতৎপরতার ব্যাপারে বাংলাভাষী পাঠকদেরকে সচেতন করার লক্ষ্যে সিজদাহ পাবলিকেশন বেশকিছু প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। তারই ধারাবাহিকতায় এই বইটি আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা, যা ইতিমধ্যে মলাটবদ্ধ হয়ে 'আধুনিক প্রাচ্যবাদের কবলে মুসলিম নারীসমাজ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

৩. প্রিয় পাঠক! আপনাদের হাতে থাকা বইটি প্রস্তুত করার কর্মযজ্ঞ আমাদের জন্য মোটেই সহজ ছিল না। উপরন্তু কাজটা ছিল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের। তা সত্ত্বেও এতটুকু বলতে দ্বিধা নেই, মুহতারাম লেখক তাঁর বিস্তৃত অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার আলোকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ চ্যালেঞ্জিং কাজ আনজাম দিয়েছেন। র‍্যান্ড কর্পোরেশনের ভ্রান্তিনামার অসারতা প্রমাণের পাশাপাশি যুক্তি ও তথ্য-তত্ত্বের সংমিশ্রণে জায়গায় জায়গায় প্রশ্ন তুলেছেন খোদ পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি তুলে ধরেছেন পশ্চিমাদের ডাবলস্ট্যান্ডবাজি ও পশ্চিমা-সমাজের করুণ অবস্থার ফিরিস্তি। তিনি একে একে আলোকপাত করেছেন

কথিত নারী-অধিকার, নারী-স্বাধীনতা, নারীমুক্তি আন্দোলন, ফ্রি মিক্সিং ইত্যাদি নিয়ে। এসব বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের পাশাপাশি বাতলে দিয়েছেন আমাদের করণীয়-বর্জনীয়—সবটাই। অনন্তর সব শ্রেণির পাঠকের কথা লক্ষ রেখে লেখকের শব্দ চয়ন, বর্ণনাভঙ্গিও ছিল অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল। কাজেই সার্বিক বিবেচনায় এ কথা বলাই যায় যে, এ কাজটি বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য লেখকের তরফ থেকে এক অনন্য উপহার। যা বাংলাভাষায় অনন্য সংযোজনও বটে। আল্লাহ লেখককে উম্মাতে মুসলিমার পক্ষ থেকে উত্তম বদলা দান করুন। তাঁর ইলমে-আমলে বারাকাহ নসিব করুন। সাথে সাথে যারা এই বইয়ের পেছনে শ্রম দিয়েছেন, আমরা দিল থেকে তাদের শুকরিয়া আদায় করছি এবং দুআ করছি, আল্লাহ যেন তাদের প্রত্যেকের খেদমত কবুল করে নিয়ে উত্তম বদলা দান করেন। আমিন।

৪. আমরা আশা করছি, এ বইটি পাঠকদের মনে নতুন নতুন অনেক ফিকির তৈরিতে বিরাট ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি যেসকল পাঠক এখনো পর্যন্ত পশ্চিমাদের নারীবাদী এজেন্ডা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখে না, তাদের জন্যও এই বইটি আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে বলব, মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়; যদি কোনো ভুলত্রুটি বিজ্ঞ পাঠকের নজরে আসে, তাহলে আমাদেরকে জানানোর আকুল আবেদন রইল। আমরা পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই তা শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ।

প্রকাশক
সিজদাহ পাবলিকেশন

সূচি

ভূমিকা

উপনিবেশের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত প্রত্যেক ব্যক্তিই এ বিষয়টি স্বীকার করবে যে, ইসলামি বিশ্বে পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে ইউরোপের অন্যতম টার্গেট ছিল মুসলিম নারীসমাজ। মুসলিম-সমাজে তাদের কর্তৃত্ব ও আদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারী-সংক্রান্ত বিষয়াবলিকে তারা প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

বর্তমানেও আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে নারী সংশ্লিষ্ট অসার কিছু স্লোগানকে। আধুনিক মিডিয়া ও যোগাযোগ-মাধ্যম ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় কল্যাণে এই আগ্রাসনের মাত্রা ও ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পশ্চিমায়ন, জাতিসংঘের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায়নের ফলে মুসলিমদের ওপর বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন একটি শৈল্পিক ও বৈধ রূপ ধারণ করেছে। যার দরুন পশ্চিমের এই মানসিক দাসত্বকেই মুসলিম নারীরা স্বাধীনতা ও প্রগতি হিসেবে বিশ্বাস করে নিচ্ছে।

নারী-স্বাধীনতা, নারী-অধিকার, জেনডার ইকুয়ালিটি (লিঙ্গসমতা)-এর মতো মুখরোচক স্লোগানগুলো মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ পলিসিতে পশ্চিমাদের হস্তক্ষেপের অস্ত্র হিসেবে কাজ করছে। জাতিসংঘ ও আমেরিকার পলিসি মেকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো র‍্যান্ড কর্পোরেশন। এই র‍্যান্ড কর্পোরেশন পশ্চিমা রাজনৈতিক পলিসিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি

প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের অধীনে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৪৫ সালে। এরপর ১৯৪৮ সালে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারিভাবে নিবন্ধিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই র‍্যান্ড কর্পোরেশন তার নিজস্ব গবেষণা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে আমেরিকাকে পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য অন্যান্য জাতি ও রাষ্ট্রের ব্যাপারে জাতিসংঘের পলিসি মেকার হিসেবে কাজ করছে। ৪৫ টি দেশের প্রায় ১৬০০ কর্মী প্রতিষ্ঠানটিতে কাজ করছে।[১]

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের বিভিন্ন গবেষণায় সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে ইসলাম ও মুসলিম জাতি। কারণ, পশ্চিমা বিশ্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে ইসলাম ও মুসলিম জাতিকেই একমাত্র হুমকি হিসেবে দেখে আসছে। ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের রিপোর্টগুলো যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে প্রতিষ্ঠানটিকে উপনিবেশের স্বার্থে প্রাচ্যবাদী[২] প্রতিষ্ঠানের ভূমিকায় আবিষ্কার করতে পারি। উপনিবেশ আমলে মুসলিম বিশ্বের ওপর আদর্শিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যকে পাকাপোক্ত করার জন্য তৎকালীন প্রাচ্যবিদরা যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, র‍্যান্ড কর্পোরেশনের কার্যক্রমকে সেই প্রচেষ্টারই আধুনিক রূপ হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

বর্তমানে মুসলিমদের আদর্শ ও জ্ঞানগতভাবে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার জন্য এমন অনেক প্রাচ্যবাদী প্রতিষ্ঠানই কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু র‍্যান্ড কর্পোরেশনের

---

১. আধুনিক প্রাচ্যবাদ, র‍্যান্ড কর্পোরেশন ও মডারেট মুসলিমদের অসারতা নিয়ে লেখকের পৃথক কাজের পরিকল্পনা আছে। সেখানে র‍্যান্ড কর্পোরেশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

২. প্রাচ্যবাদ বলা হয়, পশ্চিম কর্তৃক প্রাচ্যের ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, দীন ও আকিদা নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করাকে। আর এটা করা হয় প্রাচ্যকে নিছক জানার জন্য, কিংবা প্রাচ্যের ওপর পশ্চিমের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রাচ্যের লোকদের নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপারে বিভ্রান্ত করে পশ্চিমের সভ্যতা-সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার জন্য। (আল ইসলাম ওয়াল মুসলিমুন বাইনা আহকাদিত তাবশির ওয়া জিলালিল ইসতিশরাক, পৃষ্ঠা ৯০)
আর প্রাচ্যবিদ তাদের বলা হয়, যেসব অপ্রাচ্যরা প্রাচ্যকে নিয়ে গবেষণা করে এবং নিজেদের এই গবেষণাকে পশ্চিমা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও এনজিওকে প্রদান করে। যেন তারা এগুলো ব্যবহার করে মুসলিমদের ওপর নিজেদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও আদর্শিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। (আজনিহাতুল মাকরিস সালাসাহ, পৃষ্ঠা ২১)

মতো সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত গবেষণাকর্ম খুব কমই দৃষ্টিগোচর হবে। হতে পারে সম্প্রতি অন্য কিছু থিঙ্কট্যাঙ্ক র‍্যান্ডের স্থান দখল করে নিয়েছে। তথাপি র‍্যান্ডের রিপোর্টগুলোর প্রাসঙ্গিকতা ও বাস্তবতা এখনো বহাল আছে। বরং বলা ভালো, র‍্যান্ডের প্রাচ্যবাদী প্রচেষ্টাকে যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি, তাহলে অন্যান্য প্রাচ্যবাদী প্রচেষ্টাকেও আমরা খুব সহজেই ধরে ফেলতে পারব এবং সতর্ক হতে পারব।[৩]

২০০৮ সালে র‍্যান্ড কর্পোরেশন মুসলিম নারীদের নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। যার শিরোনাম ছিল, 'Women and nation building' (নারী ও জাতি গঠন)। প্রতিষ্ঠানটির ছয়জন বিশেষজ্ঞ গবেষক রিপোর্টটি তৈরিতে কাজ করেছে। তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হলো 'শেরল বেনার্ড' (Cheryl Benard)।[৪]

একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, আলোচিত গবেষণাটি আফগানিস্তানের নারীদের কেন্দ্র করে প্রস্তুত করা হয়েছে।[৫] উদ্দেশ্য ছিল, আফগানে আমেরিকান

---

৩. যদিও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের অধঃপতনকাল শুরু হয়ে গেছে, তথাপি তাদের বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি; বরং তাদের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কিছুটা পরিবর্তন আসা শুরু করলেও পশ্চিমা দর্শনগুলোর প্রভাব পরিপূর্ণ বহাল আছে। তাই এখনই সময় এই মতবাদগুলোর ওপর শক্ত আঘাত হানার।

৪. একজন ইহুদি নারী। জন্মের পূর্বেই তার পিতা আমেরিকাতে চলে আসে। ১৯৫৩ সালে সে আমেরিকাতে জন্মগ্রহণ করে। শৈশব জীবনে সে জার্মান ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রিতে একজন চাইল্ড অ্যাক্টর হিসেবেও কাজ করে। আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ বৈরুত থেকে সে পররাষ্ট্রনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করে এবং ইউনিভার্সিটি অফ ভিয়েনা থেকে রাজনীতিতে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করে। শেরল বেনার্ড র‍্যান্ড কর্পোরেশনের একজন প্রভাবশালী গবেষক। বিশেষত ইসলামি বিশ্ব নিয়ে তার আগ্রহ অনেক। সেই জায়গা থেকে সে ইসলামি বিশ্ব নিয়ে র‍্যান্ডের প্রায় প্রতিটি গবেষণাতেই অংশগ্রহণ করেছে। তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রিপোর্টটি হলো, সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম। যেটি ২০০৩ সালে র‍্যান্ড কর্পোরেশন থেকে প্রকাশিত হয়।

৫. আরও ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, সম্প্রতি আফগানে ইসলামি ইমারাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কথিত নারী-অধিকারের দোহাই দিয়েই তালেবানদের ইসলামি শাসনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলছে। ইসলামি ইমারাত অফ আফগান ফ্রি-মিক্সিং, পতিতাবৃত্তি, নারী ক্রিকেট টিম, মিউজিক ও মুভি ইন্ড্রাস্ট্রি নিষিদ্ধ এবং হিজাবকে আবশ্যক করার ফলে কথিত মানবাধিকার সংস্থা, মিডিয়া ও নারীবাদী সংগঠনগুলো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে। তারা আফগান নারীদের স্বাধীনতা নিয়ে খুব উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করছে। প্রকৃতপক্ষে এটা সেই উপনিবেশবাদী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। নারী-অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়নের আড়ালে তারা মূলত মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমা পলিসি বাস্তবায়ন

শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কীভাবে সেখানকার নারীসমাজকে পশ্চিমা স্বার্থে ব্যবহার করা যায়। রিপোর্টটি আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হলেও তা সব মুসলিম অধ্যুষিত দেশেই মুসলিম নারীদের পশ্চিমায়ন করার একটি আদর্শিক রূপরেখা হিসেবে কাজ করছে। ফলে এই রিপোর্টটিকে সামনে রেখেই আমরা মুসলিম নারীদের প্রতি আধুনিক প্রাচ্যবাদের স্বরূপ খোঁজার চেষ্টা করব। অবশ্য প্রাসঙ্গিকভাবে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের অন্যান্য রিপোর্ট কিংবা প্রাচ্যবাদী অন্যান্য প্রকল্পের আলোচনা আসতে পারে। তবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে উইমেন এন্ড ন্যাশন বিল্ডিং নামক রিপোর্টটি।

এ গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আমি মৌলিকভাবে শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ রচিত আল ইস্তিশরাকিয়্যাল আমরিকিয়্যাল হাদিস গ্রন্থ থেকে উপকৃত হয়েছি। পাশাপাশি শায়খ মুস্তফা আস সিবায়ি রহিমাহুল্লাহর আল মারআতু বাইনাল ইসলাম ওয়াল কানুন গ্রন্থ থেকেও অনেক সহযোগিতা পেয়েছি। বিভিন্ন গ্রন্থের সহায়তা নিলেও এই গ্রন্থদুটিই ছিল রচনার মূল উপাদান।

করে সাদা চামড়ার কলোনিয়ালিজম (উপনিবেশবাদ) টিকিয়ে রাখতে চায়। তাদের দাবি হলো, নারী-অধিকারের যে ধারণা পশ্চিমের সাথে মিলবে না, সেটাই পরাধীনতা ও পশ্চাৎপদতা। আর নারীদের সেই পরাধীনতা ও পশ্চাৎপদতা থেকে রক্ষা করতে হলে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা হতে দেয়া যাবে না।

শরিয়াহর অধীনে মুসলিম নারীর ভিক্টিম চিত্রায়ন ওয়ার অন টেররেরই একটি প্রজেক্ট। ২০০১ সালে জর্জ বুশ আফগানযুদ্ধের শুরু থেকেই এই কারণ দেখায় যে, আমেরিকা যুদ্ধ করছে আফগান নারীদের মুক্তির জন্য, আমেরিকান সেনাদের লড়াই একটি নারীবাদী লড়াই।

তার ফেমিনিস্ট স্ত্রী লরা বুশের বক্তব্য ছিল, আফগানযুদ্ধ মূলত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ; একই সাথে নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার যুদ্ধ। (https://www.kebabcast.com/afghan-war-feminism-colonialism/) লিংকের প্রবন্ধে আফগানযুদ্ধে আমেরিকার নারীবাদী প্রকল্পের প্রকৃতি চমৎকারভাবে উঠে এসেছে। দুয়েক স্থানে এ প্রবন্ধটি থেকে আমি নিজেও উপকৃত হয়েছি।

নারীদের মুক্ত করতে এসে পুরো বিশ্বে ন্যাটো বাহিনী কতটা শোষণ চালিয়েছে তা আমাদের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। স্বয়ং ন্যাটো বাহিনীর নারী সদস্যের প্রায় প্রত্যেকে যৌন হয়রানির শিকার হয়। তারা বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে তাদের মিশনগুলোতে স্থানীয় প্রচুর নারীদের ধর্ষণ করে যৌন নির্যাতন চালায়। (https://bit.ly/3y7JDqY)

এমনকি বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার মতো একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের হাত থেকেও নারীরা রক্ষা পাচ্ছে না। সেবা ও চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ নিয়ে এদের অনেক কর্মীই দেশে দেশে বিভিন্ন নারীকে যৌন হয়রানি করে যাচ্ছে। (https://cutt.ly/fRyM৬cV)

এই কাজটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সিজদাহ পাবলিকেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তিই আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। মহান আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের সকলের প্রচেষ্টাকেই কবুল করে নিন এবং মুসলিম-সমাজ, বিশেষত মুসলিম নারীদের এই বইটির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে উপকৃত করুন। আমিন।

হাসসান বিন সাবিত

০৩ অক্টোবর ২০২১ ঈ.
(রাত ১০ : ৫৫)

ফিরে দেখা

ইসলামপূর্ব পৃথিবীতে নারীদের অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তৎকালীন প্রতিটি জাতির ভেতর নারীদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। আরব সমাজের কথাই ধরা যাক। সেখানে নারীদের না ছিল কোনো উত্তরাধিকার, না ছিল স্বামীর কাছে কোনো অধিকার, আর না ছিল তালাক ও বিয়ের কোনো সীমা। ছিল না তার নিজের প্রিয় মানুষটিকে পছন্দ করার অধিকার। কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়াকে তারা ভীষণ অশুভ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করত। মেয়ে সন্তান জন্ম নেওয়াকে আভিজাত্যের কলঙ্ক ভেবে তাকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলত। রোমান ও গ্রিক সাম্রাজ্যেও নারীদের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা বা অধিকার ছিল না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন ১৭ বছর, ৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সে তখন একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল নারীকে কী হিসেবে বিবেচনা করা হবে? মানুষ হিসেবে না-কি অমানুষ হিসেবে? সবশেষে স্থির হয়, সে মানুষ হিসেবে বিবেচিত হবে বটে, তবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল পুরুষদের সেবার জন্য। পাশ্চাত্যবাসীর পক্ষ থেকে নারীর প্রতি এই অবজ্ঞা মধ্যযুগ পর্যন্ত বহাল ছিল। উক্ত সম্মেলনের সিদ্ধান্ত যা-ই হোক, সম্মেলনের বিষয়বস্তুটিই নারীসত্তার প্রতি চরম অবজ্ঞা। পশ্চিমা বিশ্ব তখন এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারেনি যে, নারীরা মানুষ না-কি অমানুষ। এরপর যখন তারা নারীকে মানুষ হিসেবে ভাবতে শিখল, তখন তাদের সে ভাবাটাও ছিল নারীর অধিকার চরমভাবে লঙ্ঘন করে।

নারীর প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি কতটা জঘন্য ছিল, তা কল্পনা করার মতো না। ১৮০৫ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ আইনে স্ত্রীকে বিক্রি করে দেওয়ার অধিকার স্বামীর জন্য সংরক্ষিত ছিল। এই সময় স্ত্রীর মূল্য বেধে দেওয়া হয়েছিল ছয় পেনস। তখনকার ইউরোপের পুরুষরা ঋণ পরিশোধ না করতে পারলে পাওনাদারের কাছে নিজের স্ত্রীকে বন্ধক হিসেবেও রাখত। তাদেরকে বাজারে তুলত বিক্রির জন্য। এমনকি নারীদের বিক্রির জন্য আলাদা বাজারব্যবস্থাও ছিল।[৬]

সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে যখন বিশ্বের সকল অঞ্চল ও সমাজে নারী-জীবন ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন, ঠিক তখনই আরবের বুকে মক্কা নগরীতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ঘটে। নবুওয়াতপ্রাপ্তির মাধ্যমে তার পবিত্র জবানে ইসলামের ঐশী বাণীর আবির্ভাব হয়েছে এই পৃথিবীতে। ইসলাম এসে নারীকে দিয়েছে সর্বকালের সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও সম্মানজনক অবস্থান। এই অবস্থান একই সাথে নারীকে তার যথার্থ অধিকার ও দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছে এবং সমস্ত পাশবিকতা ও অনিরাপত্তার বলয় থেকে তাকে মুক্ত করেছে।

নারী-অধিকার প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামের সুন্দরতম দিক হলো, এখানে নারীর স্বভাব-প্রকৃতির ওপর পরিপূর্ণ লক্ষ রাখা হয়েছে এবং নারী-পুরুষকে এক সত্তা হিসেবে বিবেচনা না করে তাদের মাঝে বণ্টননীতির ভিত্তিতে দায়িত্ব ও অধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু এই ভারসাম্য পশ্চিমা নারী-অধিকারে রক্ষা করা হয়নি; বরং সেখানে নারীর নারীত্বের প্রতি শোষণ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং নারী-পুরুষকে একে অপরের সহযোগী বানানোর পরিবর্তে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মূলত ইসলাম আগমনের পর থেকেই পৃথিবীর বুকে নারীর প্রকৃত অধিকার বাস্তবায়নের ধারা শুরু হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে নারী-অধিকারের প্রসঙ্গ কোনো সংকটের বিষয় ছিল না। নারীরা তাদের অধিকারপ্রাপ্তির জন্য পশ্চিমাদের মতো ফেমিনিস্ট (নারীবাদী) আন্দোলনের মুখাপেক্ষীও ছিল না। নারীদের কোনো আবদার ও আন্দোলন ছাড়াই ইসলাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের যথার্থ অধিকার বুঝিয়ে দিয়েছে।

আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন, পৃষ্ঠা ১৭

৬. আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন, পৃষ্ঠা ১৭ নেটে wife selling লিখে সার্চ করলেই অনেক প্রামাণ্যচিত্র নারীকে বিক্রি করার দৃশ্য দেখার জন্য নেটে wife selling লিখে সার্চ করলেই অনেক প্রামাণ্যচিত্র পেয়ে যাবেন।

আমরা ইসলামি ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখব, মুসলিম দেশগুলোতে ইউরোপীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত নারীসমাজের চিত্র ছিল প্রায় একইরকম। খোলামেলা পোশাক পরিধান, ফ্রি-মিক্সিং, নাটক, সিনেমা, অভিনয়, নারীদের রাজনৈতিক তৎপরতা, কর্মসংস্থানের প্রতি ব্যাপক ঝোঁক ইত্যাদি ছিল না। বিচ্ছিন্ন কিছু দৃষ্টান্ত থাকলেও এটাই ছিল স্বাভাবিক চিত্র। নারীরা পরিবার ও প্রজন্ম গড়ে তোলার দায়িত্বকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করত। তবে শিক্ষাকার্যক্রম, গৃহশিল্প ও চিকিৎসাবিদ্যা—এই তিন সেক্টরে মুসলিম নারীদের বিরাট ভূমিকা আছে। তথাপি মুসলিম নারীদের মূল মনোযোগ ছিল পরিবার ও প্রজন্ম গঠন। রাজনৈতিক সক্রিয়তা কিংবা পাইকারি হারে কর্মক্ষেত্রে বিচরণের যে সংস্কৃতি ও নিঃশর্ত দাবি বর্তমান সমাজে দেখা যায়, তখনকার যুগে এটা ছিল কল্পনাতীত বিষয়।

সামগ্রিকভাবে এই চিত্রে পরিবর্তন ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম দেশগুলোতে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে। যদিও প্রাচ্যবাদের সূচনা হয়েছিল উপনিবেশ আমলের আগেই। কিন্তু তখনকার সময় ইউরোপের লোকেরা প্রাচ্যকে পাঠ করত কেবল জ্ঞানতাত্ত্বিক জায়গা থেকে। কিংবা বলা যায়, গুটিকয়েক প্রাচ্যবিদ ইসলামি শরিয়াহর ওপর বিভিন্ন সংশয় ও বিকৃতি আরোপ করলে সেটা তখনকার সমাজে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি; বরং ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রের মাধ্যমেই তৎকালীন অনেক প্রাচ্যবিদ প্রভাবিত হয়েছে। কেউ কেউ তো ইসলামও গ্রহণ করেছে।

প্রাচ্যবাদে এক নতুন মোড় ও শক্তি আসে উপনিবেশ আমল থেকে। তখন একদিকে জ্ঞানতাত্ত্বিক উদ্দেশ্য ছাড়াও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, উপনিবেশবাদী বিভিন্ন স্বার্থ প্রাচ্যবাদের সাথে জুড়ে যায়। অন্যদিকে মুসলিম দেশগুলোতে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত থাকায় তারা মুসলিম-সমাজকে প্রভাবিত করতেও সক্ষম হয়। উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো মুসলিম-সমাজের মধ্য থেকে নারীদের বেছে নেয় ইসলামি শরিয়াহর সাথে তাদের আদর্শিক যুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে।

সেই সূচনাকাল থেকেই কেন পশ্চিমারা মুসলিম-সমাজকে ধ্বংস করার জন্য মুসলিম তরুণীদের টার্গেট করেছে, এর কারণটা ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহর বিখ্যাত উক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, 'উম্মাহর অর্ধেক হচ্ছে নারী, আর বাকি অর্ধেককেও জন্ম দিয়েছে নারী। তাই বলা যায়, পুরো

উম্মাহই হলো নারী।'[৭] মুসলিম-সমাজ গঠনে নারীরা মৌলিক ভূমিকা পালন করে। ইসলাম একজন নারীকে সে অবস্থান ও ক্ষমতা দিয়েছে। একদিকে তারা মুসলিম-সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী, অন্যদিকে বাকি অর্ধেক জনগোষ্ঠীও তাদের ওপর নির্ভরশীল। উপরন্তু তাদের গড়ে তোলা ও প্রভাবিত করার বিরাট ক্ষমতা নারীর হাতে বিদ্যমান। এজন্য পশ্চিমা বিশ্ব সেই উপনিবেশকাল থেকেই মুসলিম নারীদের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করার অপচেষ্টা করেছে। কারণ, তাদের মতে নারীসমাজকে আদর্শিক ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রভাবিত করা মানে পুরো মুসলিম-সমাজকেই প্রভাবিত করা।

১৮ শতকের ফ্রান্স কর্তৃক আলজেরিয়ার কলোনাইজেশনের প্রক্রিয়ায় আলজেরীয় নারীদেরকে সে প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়। মুসলিম নারীর বোরকাকে উপস্থাপন করা হয় দাসত্বের প্রতীক হিসেবে। বিখ্যাত মার্তিনিকান দার্শনিক ফ্রাঞ্জ ফানো (Frantz Fanon) [১৯২৫-১৯৬১] Unveiling Algeria প্রবন্ধে লেখেন, 'যদি আমরা আলজেরীয় সমাজ ও এর প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে দিতে চাই, তাহলে অবশ্যই তাদের নারীদের ওপর আমাদের বিজয়ী হতে হবে। পর্দার অন্তরাল থেকে ও সেসব বাড়িঘর থেকে তাদের খুঁজে বের করতে হবে, যেখানে তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখে এবং পুরুষরা তাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকে।'[৮]

তারা বোঝে পরিবার ও সমাজ গঠন করা এবং তাকে নষ্ট করার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা কতটা কার্যকর।[৯] আর সেই থেকেই তারা মুসলিম নারীদের মুক্ত করার আন্দোলন শুরু করে। মুসলিম নারীদের বিভ্রান্ত করার জন্য উপনিবেশবাদীরা বিশেষ কিছু ক্ষেত্রকে ব্যবহার করে থাকে।

এর মধ্যে প্রধান ক্ষেত্র হলো 'মুসলিমদের শিক্ষাব্যবস্থা'। উপনিবেশবাদীরা স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়ে মুসলিম দেশগুলোতে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে এবং তাদের অধীনে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে বসে। এসব প্রতিষ্ঠানে তারা মুসলিমদের পাশ্চাত্য আদর্শে গড়ে তোলে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, মাত্র কয়েক

---

৭. তুহফাতুল মাওলুদ ফি আহকামিল মাওলুদ, পৃষ্ঠা ১৬

৮. (নেইল ম্যাকমাস্টার- Burning the veil: The Algerian war and the 'emancipation' of Muslim women)
https://www.theguardian.com/world/2002/sep/21/gender.usa

৯. আজনিহাতুল মাকরিস সালাসাহ, পৃষ্ঠা ৪১৫

বছরের মধ্যেই তারা নারী শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করায় যে, পশ্চিমা বিশ্বের নারীরা তোমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। এজন্য তোমাদেরকে তাদের মতো পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে, রাস্তায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে নিজেকে প্রকাশ করে চলতে হবে। এটাই প্রগতিশীলতা। কিন্তু ইসলাম তোমাদের এই উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ইসলাম চায় তোমাদেরকে ঘর-বন্দি করে রাখতে। এজন্য ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তোমাদের ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতে হবে।[১০]

নারীদের নষ্ট করার জন্য তাদের প্রয়োগকৃত দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হলো, নতুন নতুন বিভিন্ন শাস্ত্র ও অঙ্গন মুসলিম দেশগুলোতে আমদানি করা। যেমন : ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি, বিউটি ইন্ডাস্ট্রি, বিউটি কম্পিটিশন, ফ্যাশন ম্যাগাজিন ইত্যাদি বিষয়গুলো তারা মুসলিমদের মাঝে আমদানি করে, যা ইতিপূর্বে মুসলিম বিশ্বে ছিল না।[১১] এসব পাশ্চাত্য পশু-সংস্কৃতি মুসলিম বিশ্বে আমদানির কারণে মুসলিম নারী-পুরুষ ভুলে যেতে থাকে পর্দার বিধান, ছুঁড়ে ফেলে ফ্রি-মিক্সিংয়ের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলার কঠোর নিষেধাজ্ঞা। দেহ প্রদর্শনের উন্মুক্ত বাজারে তারাও উন্মাদনায় লিপ্ত হয়ে যায়।

মিশরে ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর ১৮৯৪ সালে মার্ক ফাহমি (১৮৭০-১৯৫৫) আল মারআতু ফিশ শিরকি নামে একটি বই লেখে। মার্ক ফাহমি ছিল উপনিবেশবাদী, বিশেষত লর্ড ক্রোমারের[১২] আস্থাভাজন লোক। তার বইয়ে মুসলিম নারীদের নিয়ে উপনিবেশবাদীদের কর্মপন্থা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। বইটিতে সে মৌলিকভাবে পাঁচটি দাবি তোলে—

১. ইসলামি হিজাবকে নিষিদ্ধ করা।

২. গাইরে মাহরাম পুরুষদের সাথে ফ্রি-মিক্সিংয়ের বৈধতা দেওয়া।

৩. তালাককে শর্তযুক্ত করা এবং তা কেবল কাজির সামনে কার্যকর হওয়ার বিধান জারি করা।

---

১০. আজনিহাতুল মাকরিস সালাসাহ, পৃষ্ঠা ৪১২-৪১৪

১১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৩, ৪২২

১২. ১৮৮২ সালে ব্রিটিশরা মিশর দখল করে। দখলের পর থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত বৃটিশরা নিজেদের প্রতিনিধি নিয়োগ করে মিশরকে শাসন করতে থাকে। এর মধ্যে ক্রোমার অন্যতম। সে ১৮৮২ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত মিশরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। মূলত তার নেতৃত্বেই মুসলিম-সমাজের ভেতর পশ্চিমা চিন্তাধারার ব্যক্তিত্ব তৈরির কার্যক্রম পরিচালিত হতো।

৪. একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করা।

৫. অমুসলিমদের সাথে বিয়ের বৈধতা দেওয়া।[১৩]

এটাই ছিল মুসলিম নারীদের নিয়ে উপনিবেশবাদী পরিকল্পনার প্রথম বীজ, যেই বীজ তারা মুসলিমদের অভ্যন্তরে অঙ্কুরিত করতে পেরেছিল। কাসিম আমিন ও হুদা শারাওয়ী-এর নারী-মুক্তি আন্দোলন এই বীজেরই ফসল। কাসিম আমিনের তাহরিরুল মারআহ[১৪] ও আল মারআতুল জাদিদাহ বইদুটি উপনিবেশবাদী স্বার্থ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে। মিশরে লিখিত এসব বই ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে অনূদিত হয়ে ভারতবর্ষেও বিস্তার লাভ করে। এখান থেকেই শুরু হয় নারী-অধিকার কিংবা নারী-মুক্তির নামে মুসলিম নারীদের পশ্চিমা ধর্মে ধর্মান্তরিত করা এবং সেই দোহাই দিয়ে শরিয়াহকে সংস্কার করার মিশন। যেই মিশন লর্ড ক্রোমারের নেতৃত্বে শুরু হয়ে আজ শেরল বেনার্ড এর মতো ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমে চলমান আছে।

ক্রোমার তার Modern egypt বইতে মিশরকে পশ্চিমাকরণের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলে, 'কেবল মোহাম্মাদান (মুসলিম) নীতিমালা আর প্রাচ্যীয় ধ্যানধারণার ভিত্তিতে গড়া সরকারকে ইউরোপ মেনে নিবে এমন ধারণা করাই হাস্যকর। মুসলিম দেশগুলোতে নারীর সামাজিক অবস্থান ইউরোপীয় ধ্যানধারণা প্রচারের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। নতুন প্রজন্মের মিশরীয়দের বুঝিয়েসুঝিয়ে কিংবা প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করে পশ্চিমা সভ্যতার মূল চেতনা ধারণ করাতে হবে।'[১৫]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উপনিবেশবাদীরা শারিরীকভাবে মুসলিম দেশগুলো থেকে বিদায় নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের উপনিবেশ শেষ হয়ে যায়নি; বরং তারা মুসলিমদের ভেতর থেকে তাদের সভ্যতার ধারকবাহক এক শ্রেণির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে যায় এবং উপনিবেশের পূর্বে মুসলিম দেশগুলোতে যে শরিয়াহব্যবস্থা

---

১৩. হারাকাতু তাহরিরুল মারআতি, আনোয়ার আল জুন্দি, পৃষ্ঠা ২৬

১৪. বলা হয়, কাসিম আমিনের তাহরিরুল মারআহ বইটির কিছু অধ্যায় মুহাম্মাদ আবদুহুর লেখা কিংবা বইটির সম্পাদনা তার হাতেই করা। মোটকথা, তাহরিরুল মারআহ বইটির সাথে তার সম্পৃক্ততা রয়েছে।

১৫. https://ia802606.us.archive.org/7/items/modernegypt00crom/modernegypt00crom.pdf

প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেটাকে ধ্বংস করে দিয়ে নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করে যায়। রেখে যাওয়া এই ব্যবস্থা ও ব্যক্তিদের মাধ্যমে তারা মুসলিম-সমাজের ওপর আজও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপনিবেশ কায়েম করে রেখেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তারা মুসলিম দেশগুলোতে বুদ্ধিবৃত্তিক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন নামে ও রঙে যে পলিসি গ্রহণ করেছে, সেখান থেকেই শুরু হয়েছে আধুনিক প্রাচ্যবাদ।

আধুনিক এই প্রাচ্যবাদের সময়কালকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম কাল হলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ৯/১১ পর্যন্ত; দ্বিতীয় কাল ৯/১১ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। ৯/১১ এর পর থেকে আধুনিক উপনিবেশবাদ ও প্রাচ্যবাদ নতুন মোড় লাভ করে। এই ঘটনার পর তারা বিশাল এক ধাক্কা অনুভব করে। ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তাদের দাম্ভিকতার ঠুনকো দেয়াল। ফলে তারা হিংস্র কুকুরের মতো আফগানে আক্রমণ করে সেখানকার ইসলামি সরকারকে উৎখাত করে এবং সেই জায়গায় তাদের মদদপুষ্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠা করে। এই ঘটনার পর তারা ইসলামকে সংস্কার করে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে অসাংঘর্ষিক একটি ধর্মে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টাকে জোরদার করে। কারণ তারা জানে, ইসলাম যদি তার আদি অবস্থার ওপর অবিচল থাকে, তাহলে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে এর সংঘর্ষ নিশ্চিত এবং ভবিষ্যতে তারা ইসলামি বিশ্বের পক্ষ থেকে আরও বড় ধরনের আঘাতের সম্মুখীন হতে পারে। এজন্যই আমরা দেখি, মুসলিম-সমাজ নিয়ে আদর্শিক দিক থেকে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টগুলো ৯/১১ এর পর তৈরি।

প্রাচ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের দীর্ঘ এই পরিক্রমায় বর্তমান সময়ে এসে একটি ভয়াবহ পার্থক্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সেটা হলো, আগের প্রাচ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের সময় অধিকাংশ মুসলিম এটা অনুভব করতে পেরেছিল যে, আমাদের ওপর কেউ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। যারা আমাদের দীন ও দেশের জন্য হুমকি। কিন্তু আধুনিক সময়ের প্রাচ্যবাদ ও উপনিবেশবাদকে মুসলিমরা অনুভব করতে পারছে না; বরং তারা এই উপনিবেশকে নিজেদের জন্য আশির্বাদ মনে করে বসে আছে। আধুনিক উপনিবেশের চাপিয়ে দেওয়া আদর্শকে তারা প্রগতি ও উন্নতির সোপান মনে করছে।

কিন্তু আধুনিক উপনিবেশ আমাদের দীন ও শরিয়াহকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে আমাদের বিন্দুমাত্র ভাবনা নেই। হারিয়ে যাওয়া সেই ভাবনা ও অস্থিরতাকে জাগরূক করতেই আপনাদের সামনে আধুনিক প্রাচ্যবাদের একটি দিক তুলে ধরছি। যে দিকটা এই উম্মাহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ—নারীসমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট।

নারী-অধিকার

'নারী-অধিকার' র‍্যান্ড কর্পোরেশনের রিপোর্টটিতে সবচেয়ে আলোচিত একটি শব্দ। এই শব্দকে ঘিরেই তাদের পুরো গবেষণা পরিচালিত হয়েছে এবং এই শব্দকে ঘিরেই পশ্চিমা দেশ ও বিশ্বসংস্থাগুলোর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এমনকি র‍্যান্ড মুসলিম-সমাজের ভেতর চিন্তাযুদ্ধ পরিচালনার প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে 'নারী-অধিকার'-কেই বেছে নিয়েছে।[১৬]

মূলত এটি মুসলিমদের সাথে পশ্চিমাদের একটি মনস্তাত্ত্বিক লড়াই। তারা নারী-অধিকারের কথা বারবার উল্লেখ করা সত্ত্বেও এর কোনো যথার্থ সংজ্ঞা রিপোর্টটিতে উল্লেখ করেনি। এই ব্যাপারে তাদের বক্তব্য হলো, নারী-অধিকারকে অনেকেই অনেকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। আমরা নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞার প্রতি আহবান করছি না। কিন্তু আমরা এমন কিছু সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাতে পারি, যারা নারী-অধিকারের ব্যাপারে সঠিক ধারণা রাখবে এবং সেটা বাস্তবায়নে কাজ করে যাবে।[১৭]

পশ্চিমা বিশ্ব নারী-অধিকারকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং নির্বাচনে আগ্রহী দলকে সমর্থন জোগানের ক্ষেত্রে প্রধান প্রশ্ন হিসেবে দেখে।[১৮]

---

১৬. Building moderate muslim networks, angel rabasa & others, rand 2007, p 42

১৭. Women and nation building, p 129

১৮. A sense of siege : the geopolitics of islam and the west, p 130

২০০৭ সালে প্রকাশিত র‍্যান্ড কর্পোরেশনের আরেকটি রিপোর্টের ভাষ্য হলো, নারী-পুরুষের মাঝে সাধারণ সমতাকে শ্রদ্ধা করার ব্যাপারটি মডারেট মুসলিমদের প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত শর্ত বলে বিবেচিত হবে।[১৯]

যদিও তারা নারী-অধিকারের কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারেনি, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় নারী-অধিকার সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়কে উল্লেখ করেছে এবং নারী-অধিকারের দাবির অধীনে তারা এই বিষয়গুলোর বাস্তবায়নকেই প্রত্যাশা করে। যেমন : শাসক হওয়া, মন্ত্রী হওয়া, প্রধান বিচারপতি হওয়া, উত্তরাধিকারে সমান ভাগ পাওয়া, অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বাড়ির বাইরে অবস্থান করতে পারা, মাহরাম ছাড়া চলাফেরা করতে পারা, ফ্রি-মিক্সিং পরিবেশে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পাওয়া, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পূর্ণ অধিকার লাভ করা এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন পদে সমানভাবে কাজ করতে পারা ইত্যাদি।

মুসলিম বিশ্বে নারী-অধিকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও র‍্যান্ডের পর্যবেক্ষণ

র‍্যান্ডের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী মুসলিম দেশগুলোতে নারী-অধিকারের প্রশ্ন জোরদার হচ্ছে। যেমন র‍্যান্ড কর্পোরেশন বিল্ডিং মডারেট মুসলিম নেটওয়ার্ক রিপোর্টটিতে দাবি করেছে যে, মুসলিম দেশগুলোতে সরকারি সংস্থার বাইরে বেসরকারি এমন সংস্থা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যারা নারী-পুরুষের মাঝে সমতার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সামাজিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।[২০]

র‍্যান্ড কর্পোরেশন মুসলিম দেশগুলোর সংবিধানও তদন্ত করে। যদি তারা সংবিধানে এমন কোনো ধারা দেখতে পায়, যেটা জেন্ডার ইকুয়ালিটিকে (লিঙ্গসমতাকে) সমর্থন করে, তবে তারা এই ধারাকে বহাল ও সংরক্ষিত রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করে। যেমনটা তারা আফগানিস্তানে আমেরিকান শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় সংবিধানকে পর্যালোচনা করার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছে।[২১]

---

১৯. Building moderate muslim networks, angel rabasa & others, rand 2007, p 83

২০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৩-৮৪

২১. democracy and islam in the new constitution of afganistan, rand

২০০৭ সালের রিপোর্টে তারা মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমা নারী-অধিকারের দাবিতে কাজ করা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার জন্য পরিকল্পনা প্রদান করেছে। সেখানে তারা জাতিসংঘ থেকে সাহায্যপ্রাপ্তির উপযুক্ত মডারেট মুসলিম হওয়ার অন্যতম শর্ত রেখেছে—নারী-অধিকারের পশ্চিমা ধারণাকে সম্মান করা।[২২]

এমনকি র‍্যান্ড কর্পোরেশনের একজন গবেষক এমন কোনো ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, যে রাষ্ট্রে নারীর অবাধ স্বাধীনতা থাকবে না।[২৩] নারীর অবাধ স্বাধীনতা না থাকা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো, নারীর পোশাকের নির্দিষ্ট নীতিমালা আরোপ করা, কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাক্ষেত্রে ফ্রি-মিক্সিংকে নিষিদ্ধ করা কিংবা কেবলমাত্র নারীদের জন্য বিশেষ কোনো সার্ভিস চালু করা।[২৪]

র‍্যান্ড কর্পোরেশন কিংবা পশ্চিমা বিশ্ব কর্তৃক কথিত নারী-অধিকারকে এত গুরুত্বের সাথে দেখা, এই ইস্যুকে মুসলিম বিশ্বের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করা এবং যেসব ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান নারী-অধিকার বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে, তাদেরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া ও সহায়তা করা—এতকিছু তারা কখনোই মুসলিম নারীদেরকে তাদের উপযুক্ত সম্মান কিংবা দায়িত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য করছে না; বরং এর পেছনে তাদের সাম্রাজ্যবাদী কিছু উদ্দেশ্য আছে, যেগুলো তারা মুসলিম নারীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে চায়।

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট নন এমন একজন আমেরিকান নারী গবেষক বলেন, 'নারী সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো গুরুত্ব দিলে গোটা দীন ও সকল মুমিনদের ওপর আক্রমণ করা খুব সহজ একটি বিষয়। মুসলিম নারীদের প্রতি পরিকল্পিত এই গুরুত্বারোপ ইসলামি প্রথা ও নৈতিকতার অধঃপতনের উদ্দেশ্যে একটি প্রাচ্যবাদী প্রকল্প হতে পারে। এজন্য করণীয় হলো, মুসলিম নারীদের ইসলামের ছায়াতল থেকে মুক্ত করা, যদিও সেটা করতে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।'[২৫]

সুতরাং নারী-অধিকারের ইস্যুকে পশ্চিমাদের এত গুরুত্ব দেওয়ার কারণ আমাদের সামনে স্পষ্ট। এর মাধ্যমে তারা মুসলিম-সমাজে নিজেদের আদর্শ ও

---

২২. Building moderate muslim networks, p 67

২৩. Islamic fundamentalism in afganistan: its charaterc and prospects, rand 1991, p 31

২৪. Algeria : the next fundamentalist state? Rand 1996

২৫. নাজরাতুল গারবি ইলাল হিজাব, পৃষ্ঠা ৮৭

চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। পশ্চিমা সেকুলার ও লিবারেল চিন্তাকে মুসলিমদের মাঝে ব্যাপক করতে চায়। সর্বোপরি মুসলিমদের তাদের দীনের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চায়।

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের দৃষ্টিতে ইসলামি শরিয়াহ ও নারী-অধিকার

র‍্যান্ড কর্পোরেশন মনে করে, সমাজের নারীদের পিছিয়ে থাকার জন্য ইসলামি শরিয়াহ দায়ী। কারণ ইসলামি শরিয়াহ নারীর ওপর বিভিন্ন ধরনের বিধান ও শর্তারোপ করার মাধ্যমে তাদেরকে সমাজ থেকে পিছিয়ে রাখে। নাইন ইলেভেনের পর প্রকাশিত র‍্যান্ড কর্পোরেশনের এক রিপোর্টে বলা হয়, শরিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা উগ্রবাদী মুসলিমদের[২৬] রাজনৈতিক সূচিপত্রের প্রধান বিষয়। আর শরিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা নারীদের ওপর বিভিন্ন শর্তারোপ করার মাধ্যমে মূলত নারী-অধিকারকে খর্ব করে।[২৭]

র‍্যান্ড কর্পোরেশন কর্তৃক ২০০৭ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, শরিয়াহ আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যদি উগ্রবাদী মুসলিমদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, তবে সেটা বিশেষভাবে সমাজে নারীদের অবস্থানকে ধ্বংস করে দেবে। কারণ, নারীরা শরিয়াহ আইনের অধীনে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়। ফলে এই শরিয়াহ আইন গণতান্ত্রিক রূপায়নকে এবং যারা নারী-অধিকার বাস্তবায়নে কাজ করছে তাদের সকল প্রচেষ্টাকে বিনষ্ট করে দেবে।

পাশাপাশি রিপোর্টটিতে লিবারেল ও সেকুলারদের আহবান করা হয়েছে, শরিয়াহর অধীন সকল প্রকার বৈষম্য ও ধর্মান্ধমূলক আচরণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং এমন রাজনৈতিক ও বিচারব্যবস্থা তৈরিতে কাজ করতে, যেখান থেকে গণতান্ত্রিক সমাজ[২৮] গঠনে কর্মরত সংস্থাগুলোর বিস্তার লাভ হয়।[২৯]

---

২৬. উগ্রবাদী মুসলিম দ্বারা তারা সেসব মুসলিমদের বুঝিয়ে থাকে, যারা মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমা আদর্শের প্রভাবের বিরোধিতা করে এবং ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা করে।

২৭. The muslim world after 9/11, p 27

২৮. সিভিল সোসাইটি কিংবা গণতান্ত্রিক সমাজ বলা হয় এমন সমাজকে, যে সমাজ নিজ আইনকানুন গঠনের ক্ষেত্রে ঐশী কোনো উৎসের ওপর নির্ভর করে না; বরং পরিপূর্ণ পশ্চিমা মূলনীতির ওপর নির্ভর করে।

২৯. Building moderate muslim networks, p 84

পাশাপাশি র‍্যান্ড নারীদের কট্টর ইসলাম ও ইসলামি শরিয়াহর জড়, আবদ্ধ ও অকেজো ব্যাখ্যার[৩০] (র‍্যান্ডের দাবি অনুযায়ী) বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার জন্যও উদ্বুদ্ধ করে। কারণ, তাদের ধারণা অনুযায়ী কট্টর ইসলাম ও শরিয়াহর পুরাতন ব্যাখ্যার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয় নারীরা।[৩১]

র‍্যান্ডের অপবাদের জবাব

র‍্যান্ডের বক্তব্য হলো, ইসলামি শরিয়াহ বিভিন্ন শর্তারোপ করে নারী-অধিকারকে খর্ব করে। এই বক্তব্য দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো, নারীদের মাহরামবিহীন সফরে বাধা দেওয়া, ফ্রি-মিক্সিংয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, বেপর্দা চলতে নিষেধ করাসহ এই ধরনের কিছু বিধানাবলি। এই দাবি সত্য এবং এরকম বিধিনিষেধ ইসলাম কেবল নারীদের ওপরই আরোপ করেনি; বরং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার ওপরই ইসলাম বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। আর এই বিধিনিষেধ আরোপের ব্যাপারটি আল্লাহর উবুদিয়্যাত তথা দাসত্বের দাবি, মুসলিমরা যে ইসলামকে গ্রহণ করে, সেই দীনের দাবি। বস্তুত প্রকৃত মুসলিম নরনারীরা বিশ্বাস করে, শরিয়াহর বিধান পালন করতে পারা এবং তার নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে থাকতে পারা তাদের মৌলিক অধিকার। কারণ ইসলাম শব্দের অর্থই হলো, আল্লাহপ্রদত্ত শরিয়াহর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ ও নতি স্বীকার করা। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا . فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .

‘আমি প্রত্যেক রাসুলকে এ উদ্দেশ্যেই কেবল পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর হুকুমে তাঁর আনুগত্য করা হবে। তারা যখন তাদের নিজেদের প্রতি

---

৩০. তাদের নিকট জড় ও আবদ্ধ ব্যাখ্যা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কুরআন-সুন্নাহর সেই বুঝ যা সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে প্রজন্ম পরম্পরায় আমাদের নিকট পৌঁছেছে।

৩১. Building moderate muslim networks, p 80

জুলুম করেছিল, তখন যদি তারা তোমার দরবারে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসুলও তাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করত, তবে তারা আল্লাহকে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুই পেত।

(হে নবী!) আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানে, তারপর আপনি যে রায় দেন, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ না করে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেয়।'[৩২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ.

'যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। আর যারা তার ডাকে সাড়া দেয়নি, তারা যদি দুনিয়ার সমুদয় সম্পদ ও তার সমপরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে যায়, তবুও তারা (কিয়ামতের দিন) নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থে তা সবই দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট রকমের হিসাব এবং তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম; অনন্তর শয্যাস্থল হিসেবে তা বড়ই নিকৃষ্টস্থল!'[৩৩]

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের আরও একটি বক্তব্য হলো, ইসলামি শরিয়াহর কারণে নারীরা সমাজে পিছিয়ে থাকে। তাদের এমন বক্তব্য সম্পূর্ণ অমূলক। ইসলামি শরিয়াহই নারীর সম্মান, মর্যাদা, সহায়তা ও তার অধিকার রক্ষায় প্রধান ভূমিকা রেখেছে। শরিয়াহর বিধানগুলো নিয়ে কেউ যদি একনিষ্ঠ হৃদয় দিয়ে গবেষণা করে, তবে সে নিশ্চিত এই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হবে। এমনকি পশ্চিমা অনেক গবেষকও উপরোক্ত স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে।[৩৪]

---

৩২. সুরা নিসা, আয়াত ৬৪-৬৫

৩৩. সুরা রাদ, আয়াত ১৮

৩৪. হাযারাতুল আরব, গাস্তিভ লেবন (১৮৮১-১৯৩১), আরবি অনুবাদ : আদিল যুয়াইতির পৃষ্ঠা ৪০১

আমেরিকান একজন নারী গবেষকের দাবি হলো, ইসলামি বিশ্বে নারী-অধিকার তখনই খর্ব হয়েছে, যখন পশ্চিমা বিশ্ব ইসলামি দুনিয়ায় প্রবেশ করেছে। যারা কথিত নারীমুক্তি ও নারী-আধুনিকায়নের স্লোগান দিয়ে বেড়ায়। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ইউরোপ যখন সিরিয়ায় অনুপ্রবেশ করে, তখন তুলা শিল্পে মুসলিমদের যে অবস্থান ছিল, তা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ওষুধজগতে নারীদের যে অগ্রগতি ছিল, ইউরোপীয় উপনিবেশের ফলে মুসলিম নারীরা তাও খুইয়ে বসে। পশ্চিমায়ন ও আধুনিকায়নের ফলে উপনিবেশ আমলে প্রতিটি মুসলিম দেশেই এই অবনতি ঘটে।[৩৫]

যে ইউরোপ মুসলিম নারীদের ইসলামি শরিয়াহ থেকে মুক্ত করার জন্য এত হয়রান, লিবারেল মতাদর্শের চাপে তাদের দেশের নারীদের অবস্থা কী রকম নাজুক, তারা কি তা লক্ষ করেছে? পরিবার ভাঙ্গন, অবাধ্য সন্তান, গর্ভপাত, নানা যৌনরোগ, ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন, আত্মহত্যাসহ ভয়াবহ সব সামাজিক সংকট তাদের পুরো সমাজকে আজ গ্রাস করে নিয়েছে। পরিসংখ্যাগুলোর তথ্যমতে ইউরোপে নবমুসলিমদের মধ্যে অধিকাংশই নারী। পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম নারীদের যে শরিয়াহ থেকে মুক্ত করার জন্য হামলে পড়ছে, তাদের নারীসমাজই অধিক হারে ইসলামি শরিয়াহর ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পাগলপারা হয়ে যাচ্ছে। কী এর কারণ?

এর কারণ হচ্ছে, জাতিসংঘ ও র‍্যান্ড কর্পোরেশনের মতো সংস্থাগুলো যে বিষয়গুলোকে নারীর উন্নতি ভাবছে, সেগুলো কখনোই একজন নারীর জন্য উন্নতির বিষয় নয়; বরং এই বিষয়গুলো প্রথমত দুনিয়াতে, অতঃপর আখিরাতে তার অধঃপতনের কারণ। তারা অধিকার ও উন্নতির নামে নারীদের ওপর বোঝা ও শোষণ চাপিয়ে দিচ্ছে। তাদেরকে পরিবারের কোমলতা ও নারীত্বের পবিত্রতা থেকে চিরতরে বঞ্চিত করে দিচ্ছে।

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের আরেকটি বক্তব্য হলো, ইসলামি শরিয়াহর অধীনে নারীরা চরম বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়। এই কথার উত্তরে আমরা বলব, ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত বৈষম্য (বিভাজন) ইসলামি শরিয়াতের সুন্দরতম বাস্তবতা, যা আমরা কখনোই অস্বীকার করব না। তা ছাড়া এই বৈষম্য (বিভাজন) জুলুম ও

---

৩৫. নজরাতুল গারবি ইলাল হিজাব, পৃষ্ঠা ৫১-৫২

অন্যায় নয়। এই বিভাজনের পেছনে যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও প্রয়োজনীয়তা আছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন, নারী-পুরুষ কেউ যেন একে অপরের সাথে সমতা কামনা না করে। তিনি বলেন,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

> 'যেসব জিনিসের দ্বারা আমি তোমাদের কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তার আকাঙ্ক্ষা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে, তাতে তার অংশ থাকবে এবং নারী যা অর্জন করে, তাতে তার অংশ থাকবে। আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।'[৩৬]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তবারি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মহান আল্লাহ তোমাদের একে অপরকে যেসব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা নিজেদের জন্য সেটা কামনা করো না।' উল্লেখ্য, আয়াতটি এমন কিছু নারীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল, যারা সবকিছুতে পুরুষের মতো অবস্থান কামনা করত এবং পুরুষের ওপর যেসব দায়িত্ব রয়েছে, তাদের ওপরও সেসব দায়িত্ব বর্তানোর আকাঙ্ক্ষা রাখত। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের এই ভ্রান্ত কামনা থেকে বারণ করেছেন এবং আল্লাহর কাছেই শ্রেষ্ঠত্ব চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৭]

দুনিয়ার সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছেই স্পষ্ট থাকার কথা যে, ন্যায়সঙ্গত বৈষম্য (বিভাজন) একটি যৌক্তিক ও জরুরি বিষয়। শরিয়াহ বহির্ভূত কথিত সমতা কখনোই মানব জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবে না। এজন্য ইসলামি শরিয়াহ ন্যায়সম্মত বিভাজনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কারণ আদল ও ইনসাফ এই বিভাজনের দাবি করে। তবে ইসলামি শরিয়ায় জুলুমের ওপর প্রতিষ্ঠিত কোনো বৈষম্যের স্থান নেই। কারণ মহান আল্লাহ তাআলা অণু পরিমাণ জুলুমও তাঁর বান্দাদের ওপর চাপিয়ে দেন না।

---

৩৬. সুরা নিসা, আয়াত ৩২

৩৭. তাফসিরে তবারি, দারুল মাআরিফ মিশর (আহমাদ শাকেরের তাহকিককৃত), ৮/২৬০

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.

'আল্লাহ কারও প্রতি অণু-পরিমাণও জুলুম করেন না। আর যদি কোনো সৎকর্ম হয়, তবে তাকে কয়েক গুণে পরিণত করেন এবং নিজের পক্ষ হতে মহাপুরস্কার দান করেন।'[৩৮]

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

'প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না। কিন্তু মানুষ নিজেই নিজের প্রতি জুলুম করে।'[৩৯]

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়ার জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

'(হে নবী!) আমি তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল রহমত হিসেবেই পাঠিয়েছি।'[৪০]

এই রহমত কখনো নারীদের বিরুদ্ধে জুলুমভিত্তিক বৈষম্যের স্বীকৃতি দেয় না। ইসলামি শরিয়াহর সমস্ত মূলনীতি ও বিধানাবলি জুলুম, স্ববিরোধিতা, অপূর্ণাঙ্গতা ও প্রবৃত্তির তাড়না থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। কারণ এই শরিয়াহ যিনি তৈরি করেছেন, তিনি হলেন মহান আল্লাহ তাআলা। আর আল্লাহ তাআলা হলেন কামালে মুতলাক (স্বয়ং পরিপূর্ণ) একক সত্তা। পক্ষান্তরে শরিয়াহর বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের তৈরি কোনো ধারণা ও আইন উপরিউক্ত ত্রুটিসমূহ থেকে মুক্ত নয়। কারণ এই ধারণা ও আইন মানবসত্তা থেকে নির্গত। আর মানুষ এক অপূর্ণাঙ্গ

---

৩৮. সুরা নিসা, আয়াত ৪০
৩৯. সুরা ইউনুস, আয়াত ৪৪
৪০. সুরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭

সত্তা, যে নিজেকে অজ্ঞতা, জুলুম, শূন্যতা ও প্রবৃত্তির তাড়না থেকে শতভাগ মুক্ত রাখতে পারে না।[৪১]

সৎভাবে ইসলামি শরিয়াহর বিধানসমূহ নিয়ে পর্যালোচনা করলে সূর্যের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইসলামই নারীকে তার যথাযথ অধিকার প্রদান করেছে। ইসলামি শরিয়ায় বাহ্যত নারী-পুরুষের মাঝে বিধানগত যেসব বিভাজন দেখা যায়, সেগুলো মূলত নারীদের কল্যাণ কিংবা সমাজের সাধারণ কল্যাণের কথা বিবেচনায় রেখেই প্রদান করা হয়েছে। পরম দয়ালু সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহ তাআলাই নারী-পুরুষ উভয় জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। নারীর প্রকৃতি, সক্ষমতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে তিনিই সর্বাধিক অবগত। ফলে নারীর সেবা নিশ্চিত করতেই তিনি পুরুষদের ওপর অতিরিক্ত কিছু বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন, যেটা নারীর জন্য কষ্টকর হবে। ইসলামি শরিয়াহ এসেছে মানুষের মাঝে ন্যায় নিশ্চিত করতে, সমতা নয়। ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইসলামি শরিয়াহর ভিত্তিই হলো, দুনিয়া ও আখিরাতে বান্দার কল্যাণ নিশ্চিত করা। শরিয়াহর পুরোটাই ইনসাফ, রহমত ও কল্যাণে ভরপুর। যা আলো থেকে জুলুমের দিকে, রহমত থেকে গজবের দিকে, কল্যাণ থেকে অকল্যাণের দিকে এবং উপকারিতা থেকে অপকারিতার দিকে নিয়ে যাবে, সেটা শরিয়াহ হতে পারে না। অর্থাৎ শরিয়াহই একমাত্র কল্যাণ, ন্যায় ও রহমত। এর বাইরে ন্যায় ও কল্যাণের কোনো অস্তিত্ব নেই।'[৪২]

যখন একজন নারী ইসলামি শরিয়াহর প্রবর্তকের গুণাবলি সম্পর্কে জানবে তখন তার অন্তর এই বিশ্বাসে ছেয়ে যাবে যে, নিশ্চয় ইসলামি শরিয়াহ আমার ওপর জুলুম করেনি। আমি যে বাহ্যিক বিভাজনগুলো দেখতে পাচ্ছি, সেগুলো ইনসাফের মানদণ্ডে সর্বোচ্চ চূড়ায় উত্তীর্ণ। কারণ মহান আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিশালী, সর্বজ্ঞানী এবং তিনি সবকিছু সম্পর্কে অবগত। তিনি সকল বিচারকের বিচারক। তিনি গায়েব জানেন। তিনি দয়ালু, মুমিনদের ব্যাপারে আরও দয়ালু। তিনি ন্যায় ও অনুগ্রহের আদেশ দেন, জালিমদের পছন্দ করেন না। সমস্ত জগতের তিনিই সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তিনি যে বিধান নির্ধারণ করেছেন, তা কখনোই জুলুম ও অকল্যাণের কারণ হতে পারে না। যদিও বাহ্যত সেই বিধান বৈষম্যপূর্ণ মনে হতে পারে।

---

৪১. আল মাদখাল লিদিরাসাতিশ শারিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ, মুআসসাসাতুর রিসালাহ বৈরুত, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০

৪২. ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন আন রাব্বিল আলামিন, দারুল জিল বৈরুত, ৩/৩

ইসলাম ন্যায়ের কথা বলে। ইসলামে শরিয়াহবহির্ভূত সমতার কোনো অস্তিত্ব নেই। কারণ শরিয়াহবহির্ভূত সমতা বান্দাকে জুলুম ও অন্যায়ের দিকে নিয়ে যায়। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ.

'পুরুষ কখনো নারীর মতো না।'[৪৩]

তিনি আরও বলেন,

> وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
>
> 'আর স্ত্রীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের প্রতি (স্বামীদের) অধিকার রয়েছে। অবশ্য তাদের ওপর পুরুষদের এক স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব (দায়িত্ব) রয়েছে। আল্লাহ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।'[৪৪]
>
> الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
>
> 'পুরুষ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।'[৪৫]

ইবনে উসাইমিন রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই আয়াতে সমতার কথা বলা হয়নি। কারণ সমতার দাবি হলো, দুটো জিনিসের মাঝে সমান বিধান করা। কিন্তু ইনসাফের দাবি হলো, সেই দুটি জিনিসের মাঝে সমতার বিধান না করে পার্থক্য করা। এজন্য আমরা যদি আদলের কথা বলি, তবে সকল সমস্যা দূর হয়ে যায়। কারণ আদলের অর্থ দুজনের মাঝে নিছক সমতার বিধান করা নয়; বরং যে যেটা পাওয়ার যোগ্য তাকে সেটা প্রদান করা। অনেকেই মারাত্মক ভুল কথা বলেন যে, ইসলাম সমতার ধর্ম। না, বরং ইসলাম ন্যায়ের ধর্ম। এজন্যই পবিত্র কুরআন বেশ কয়েকবার বিভিন্নভাবে সমতাকে নাকচ করেছে। পবিত্র কুরআনে একটি হরফও

---

৪৩. সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৬

৪৪. সুরা বাকারাহ, আয়াত ২২৮

৪৫. সুরা নিসা, আয়াত ৩৪

পাওয়া যাবে না, যা সমতার নির্দেশ করে; বরং পবিত্র কুরআন বারবার আদল তথা ন্যায়ের নির্দেশ দিয়েছে।[৪৬]

ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'নবি-রাসুল প্রেরণ এবং কিতাব অবতীর্ণের উদ্দেশ্য হলো কিসত তথা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। আর ন্যায় হলো, সমজাতীয় দুটি বস্তুর মাঝে সমতার বিধান করা। এই সমতা আবশ্যক ও প্রশংসনীয়। আর যদি দুটি বিষয় সমজাতীয় না হয়, তবে পার্থক্য করাই হলো ন্যায়।'[৪৭] সুতরাং সমজাতীয় নয় এমন দুই বিষয়ের মাঝে সমতার বিধান করা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি।

র‍্যান্ডের আরেকটি বক্তব্য হলো, ইসলামি শরিয়াহর যেসব পুরোনো, অপরিবর্তনশীল ব্যাখ্যা আছে, মুসলিম নারীদের তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। কারণ এই ব্যাখ্যাগুলোর নির্মম শিকার নারীরাই বেশি হয়। তাদের এই বক্তব্য থেকে মনে হতে পারে, তারা কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী না, কুরআন-সুন্নাহর পুরোনো ব্যাখ্যার বিরোধী। যেগুলো তাদের কাছে বর্তমান যুগে অকেজো ও বাস্তবতাবিরোধী মনে হচ্ছে। বাস্তবতা হলো তারা মূলত পুরো ইসলামেরই বিরোধী। কুরআন-সুন্নাহর পুরাতন, সংস্কারহীন যে ব্যাখ্যার তারা বিরোধিতা করছে, এর বিপরীতে আসলে তারা কোন ধরনের ব্যাখ্যা চায়? তারা ইসলামি শরিয়াহর এমন ব্যাখ্যাই চায়, যেটা পশ্চিমা মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির অনুগামী হবে। যদিও সেই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোনো সহিহ হাদিসকে অস্বীকার করা লাগুক-না কেন, পূর্ববর্তী উলামায়ে সালাফের ফিকহ ও বুঝকে প্রত্যাখ্যান করতে হোক-না কেন! অর্থাৎ তারা এমন ব্যাখ্যাকে মুসলিমদের মাঝে জনপ্রিয় করতে চায়, যে ব্যাখ্যার কোনো ইলমি ভিত্তি থাকবে না। এ ব্যাখ্যার ভিত্তি একটাই হবে, প্রবৃত্তির বাসনা পূরণ ও পশ্চিমের সাথে তাল মেলানো।

৪৬. শরহুল আকিদাতিল ওয়াসাতিয়্যাহ, ১৮৮-১৮৯

৪৭. মাজমুউল ফাতাওয়া, ২০/৮২

র‍্যান্ড কর্পোরেশন কর্তৃক মুসলিম দেশগুলোতে নারী-অধিকারের সাংবিধানিক অগ্রগতির পর্যবেক্ষণ

জাতিসংঘ পুরো বিশ্বে নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারটিকে তাদের একটি মৌলিক মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছে। তা সত্ত্বেও র‍্যান্ড কর্পোরেশন মুসলিম দেশগুলোতে সাংবিধানিক ও আইনি জায়গায় নারী-অধিকারের অবস্থাকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সালে র‍্যান্ড কর্পোরেশন কর্তৃক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি Woodrow Wilson international center for scholars এর সাথে যৌথ উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়। যার নাম ছিল, best practices : progressive family laws in muslim countries, অর্থাৎ সর্বোত্তম অনুশীলন : প্রসঙ্গ মুসলিম দেশসমূহে প্রগতিশীল পারিবারিক আইন।

উভয় পক্ষের যৌথ অংশগ্রহণে প্রকল্পটি তৈরি করা হয় এবং সেন্টারটির নিজস্ব ওয়েবসাইটে তা আরবি ভাষাসহ বিভিন্ন ভাষায় আপলোড করা হয়। প্রকল্পটির রিপোর্টে বলা হয়, আমাদের প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সংক্ষিপ্তভাবে এমন কিছু প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা, যা মুসলিম দেশগুলোতে প্রগতিশীল পারিবারিক আইন বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম অনুশীলনের নির্দেশনা দেবে। এর মাধ্যমে আমরা আশা করি, কিছু কিছু মুসলিম দেশে বিচার-বিষয়ক ও আইন-বিষয়ক ক্ষেত্রে যেসব ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন হয়েছে, সেগুলোর দিকে আরও বেশি দৃষ্টিপাত করতে পারব এবং অন্যান্য দেশ ও কর্মী–যারা এই ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে–তাদের জন্যও সুযোগ তৈরি করতে পারব।[৪৮]

জাযায়ের, মিশর, জর্ডান, লেবানন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া, পাকিস্তান, সিরিয়া, তুরস্কসহ প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশকেই এই প্রকল্পের আওতায় উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টের সবশেষে তারা নারী ও পরিবার সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক বেশ কিছু ধারা ও আইন উল্লেখ করেছে। যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আইনি ক্ষেত্রে মুসলিমরা যেন কুরআন-সুন্নাহকে অপসারণ করে পশ্চিমা আদর্শকে গ্রহণ করে নেয়। প্রকল্পটিতে যেসব প্রস্তাবনা এসেছে তার কিছু নমুনা নিচে উল্লেখ করা হচ্ছে—

---

৪৮. Best practices : progressive family laws in muslim countries, p 6

১. বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ। প্রস্তাবনাটিতে বিভিন্ন দেশের সর্বনিম্ন বয়সের মাঝে তুলনাপূর্বক আলজেরিয়ার আইনের প্রশংসা করা হয়েছে। আলজেরিয়া ১৮ বছর বয়সকে বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স হিসেবে আইন পাশ করেছে।[৪৯] তবে র‍্যান্ড ও তাদের সাথে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানটি কেবল সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণই নয়; বরং যারা এই বয়স সীমালঙ্ঘন করবে, তাদের দণ্ডনীয় শাস্তির দাবিও করেছে।

২. দ্বিতীয় বিয়ে। এই ক্ষেত্রে তারা তিউনিসিয়াকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করেছে। দেশটি দ্বিতীয় বিয়েকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং কেউ একের অধিক বিয়ে করলে তার জন্য নির্ধারিত মেয়াদে জেল অথবা জরিমানার কিংবা উভয়টিরই আইন পাশ করেছে। পাশাপাশি তুরস্ক ও লেবাননসহ আরও কিছু দৃষ্টান্ত তারা দেখিয়েছে। যেখানে একাধিক বিয়ের ওপর নানা শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

৩. অভিভাবকের অনুমতি। এই প্রস্তাবনায় তারা নারীর ওপর পিতা, ভাই ও অন্যান্য পুরুষদের অভিভাবকত্ব (পবিত্র কুরআনে যাকে কাওয়ামাহ শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং নেতৃত্বের সমালোচনা করেছে।

৪. কর্মের অধিকার। এই ক্ষেত্রে তারা ২০০৪ সালে মরক্কোর আইনে যে সংস্কার সাধিত হয়েছে, সেটাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছে। আইনটি হলো, নারী তার কর্মক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীন। স্বামী কিংবা পিতা কেউই তাকে কর্মক্ষেত্র থেকে বারণ করতে পারবে না। উপরন্তু তাদের আনুগত্যও নারীর জন্য আবশ্যক নয়।[৫০]

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের অন্য রিপোর্টে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফুটে উঠেছে। সেখানে তারা দাবি করছে যে, মরক্কোতে এই ধরনের পরিবর্তন সাধন সফল হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো, রাজনৈতিক ও সংসদীয় কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া।[৫১]

বর্তমান সময়ে নারীদের অধিক হারে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ পশ্চিমা আগ্রাসনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। নারী-অধিকার কিংবা সমতার সাথে অধিক হারে রাজনীতিতে নারীদের পদচারণার কোনো সম্পর্ক

---

৪৯. ১৮ বছর বয়সকে বিয়ের সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করার ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ ইলমি ম্যাগাজিন আল কাউসারের নিম্নোক্ত প্রবন্ধটি পড়া উপকারী হবে বলে মনে করি—https://www.alkawsar.com/bn/article/1942/

৫০. Best practices : progressive family laws in muslim countries

৫১. More freedom, less terror, p 145

নেই; বরং এর পরিপূর্ণ সম্পর্ক পশ্চিমা স্বার্থের সাথে। নারীদের ব্যবহার করে তারা মুসলিম বিশ্বে এমন কিছু পরিবর্তন সাধন করতে চায়, যা ইসলামি শরিয়াহর বিধিবিধানকে বিলুপ্ত করবে কিংবা বিকৃত করে ফেলবে। এর এক জঘন্য দৃষ্টান্ত হলো, 'হুদা শারাওয়ী'।[৫২] এই নারী ছিল মিশরে ওয়েস্টার্নাইজেশন মুভমেন্টের (পাশ্চাত্যকরণ আন্দোলনের) অন্যতম একজন নেত্রী। ১৯২৩ সালে হুদা শারাওয়ী মিশরে একটি নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। সংগঠনটি তালাকের বিধানে পরিবর্তন, ব্যাপকভাবে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান ও একাধিক বিয়েকে নিষিদ্ধ করাসহ এই ধরনের বেশ কিছু শরিয়াহবিরোধী দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আফগানিস্তানে যিনার শাস্তিসহ নারী-সংক্রান্ত শরয়ি বিধানগুলোর ব্যাপারে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের দাবি হলো, এগুলো পরিবর্তন করা উচিত। কারণ নারী-অধিকারের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন এই বিধানগুলো নাকচ করে। বিশেষ করে হুদুদ তথা দণ্ডবিধি-সংক্রান্ত বিধানগুলো।[৫৩] এজন্য আফগানের নারীসমাজের প্রতি তাদের পরামর্শ ছিল, তারা যেন দণ্ডবিধিসহ এমন যেকোনো আচরণ ও চর্চা বাতিল এবং সংশোধন করার জন্য কাজ করে, যা পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে নারীর প্রতি বৈষম্য তৈরি করে।[৫৪]

এতে সুস্পষ্ট হয়ে যায়, নারীদের অধিকার প্রশ্নে র‍্যান্ড কর্পোরেশনসহ পশ্চিমা মদদপুষ্ট সংস্থাগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্বয়ং মুসলিম নারীদের ব্যবহার করেই ইসলামি শরিয়াহর বিধানকে অকার্যকর কিংবা বিকৃত করা। আর এজন্য

---

৫২. ১৮৭৯-১৯৪৭। উপনিবেশ আমলের একজন মিশরীয় নারীবাদী নেত্রী। ফ্রান্সে পড়াশোনা করতে গিয়ে সেখানকার ইউরোপীয় সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেশে ফেরে। তারপর মিশরে মুসলিম নারীদের মাঝে পশ্চিমা ফেমিনিজম (নারীবাদ) আন্দোলনকে প্রচার করা শুরু করে। মুসলিম বিশ্বে নারীবাদী চিন্তার প্রচারক হিসেবে প্রথম সারির একজন নারী হিসেবে তাকে গণ্য করা হয়। নারীবাদী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সামাজিক ত্রাণ কার্যক্রমে ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল এই নারীর।

৫৩. এখানে একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, যিনা, অশ্লীলতাসহ এই ধরনের দণ্ডবিধি কেবল নারীদের জন্য নয়; বরং পুরুষদের ওপরও এই বিধানগুলো সমানভাবে প্রয়োগ হবে। তথাপি তারা নারীদের বিশেষভাবে এই বিধানগুলোর বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছে। এর কারণ হলো, তারা যিনা ও অশ্লীলতাকে নারীদের বিশেষ অধিকার দেখিয়ে মূলত নারীদের জাতীয়ভাবে পুরুষদের জন্য ভোগ্যপণ্য বানাতে চায়।

৫৪. Women and nation building, p 31, 34

তারা সুস্পষ্টভাবে কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে কিছু ধারণা মুসলিম মেয়েদের ভেতর বদ্ধমূল করে দিচ্ছে। সেগুলো হলো—

১. ইসলামি শরিয়াহ তাকে বস্তাবন্দি করে রাখে এবং তার উন্নতির পথকে বাধাগ্রস্ত করে।

২. ইসলামি শরিয়াহ পুরুষদের পক্ষ নিয়ে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে।

৩. নারীদের দায়িত্ব হলো, ইসলামি শরিয়াহর এসব প্রথা, বৈষম্য, পক্ষপাতিত্ব ও বন্দিত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো।

৪. নারীদের আরও দায়িত্ব হলো, অধিক হারে রাজনৈতিক ও বিচার-বিষয়ক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা এবং এই ক্ষেত্রগুলোতে নারীদের জন্য বেশি বেশি দৃষ্টান্ত তৈরি করা।

পশ্চিমা বিশ্ব ইসলামি শরিয়াহকে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে নারীদেরকে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করার অহরহ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় উপনিবেশ আমলে। যেমন সিরিয়াতে ফ্রান্সের উপনিবেশ আমলের কথা আলোচনা করতে গিয়ে শায়খ আব্দুর রহমান বিন হাসান আল মাইদানি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ফ্রান্স যখন শামে পুরো ইসলামি শরিয়াহর বিরোধী ব্যক্তিগত আইনি কাঠামো পাশ করে, তখন তার পিতা শায়খ হাসান রহিমাহুল্লাহ একদল মানুষ নিয়ে এর বিরুদ্ধে দাঁড়ান, ফলে ফ্রান্স এই আইন বাতিল করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই আইনি কাঠামো বাতিল করলেও তারা আরও জঘন্য কাজ করে। তারা মুসলিমদের ভেতর থেকেই নতুনভাবে একটি প্রজন্মকে প্রতিপালন করতে থাকে। যাদের ভেতর নেই ইসলামের কোনো বৈশিষ্ট্য, ইসলামি শরিয়াহর প্রতি যাদের নেই বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ। তারা মুসলিম দেশের জন্য ফ্রান্সের চেয়েও আরও জঘন্য বিধান ও সংবিধান প্রণয়ন করে। এভাবেই ইসলামের শত্রুরা মুসলিমদের দ্বারা চাহিদাগুলো বাস্তবায়ন করে। তারা নিজেদের হাতকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ থেকে দূরে রেখে মুসলিমদের ভেতর তাদের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করে আসছে।'[৫৫]

সুতরাং মুসলিম দেশগুলোতে বিভিন্ন ইউথ (যুব) ও নারীবাদী সংস্থাগুলোর প্রভাব সম্পর্কে বেখবর থাকা সম্ভব না। এই সংস্থাগুলো বিভিন্ন তদবির চালিয়ে

---

৫৫. আজনিহাতুল মাকরিস সালাসাহ, পৃষ্ঠা ২২৬-২২৮

রাষ্ট্রের আইন প্রণালীতে প্রভাব ফেলছে। এ ধরনের সংস্থাগুলো দেশে পশ্চিমা মূল্যবোধ বাস্তবায়নে চাপ সৃষ্টিকারী দল হিসেবে কাজ করছে।

র‍্যান্ডের রিপোর্টগুলোতে আমরা দেখতে পাই, তারা মুসলিম দেশের বিভিন্ন নারীর কার্যক্রমকে অত্যন্ত প্রশংসার সাথে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছে। যেমন ইন্দোনেশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমানের স্ত্রীর কথা র‍্যান্ডের রিপোর্টে উঠে এসেছে। যে নারী কুরআনের নারীবাদী ব্যাখ্যার দাবি তুলে একাধিক বিয়ের বিরোধিতা করেছে।[৫৬] এ ছাড়াও পুরো বিশ্বের মুসলিম কমিউনিটির বিভিন্ন নারীকে তারা দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছে, যারা কুরআন-সুন্নাহকে পাশ্চাত্যের স্বার্থ অনুযায়ী বিকৃত ও পরিবর্তন করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

নারীবাদী সংস্থাগুলো নারীদের ব্যাপকহারে রাজনৈতিক ময়দানে টেনে আনার অধিকার দাবি করার পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম পরিবার কাঠামোতে পরিবর্তন সাধন এবং পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অনুষঙ্গকে বিলুপ্তিকরণ, যেগুলো এখনো পর্যন্ত মুসলিম পরিবারগুলোর কাঠামো ও পবিত্রতাকে সংরক্ষণ করে রেখেছে।[৫৭]

উপনিবেশবাদী দেশগুলোর সাথে এসব নারীবাদী সংস্থাগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক দিন দিন বাড়ছে। এরা সেসব দেশের দূতাবাস থেকে প্রতিনিয়ত মোটা অঙ্কের আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে। পাশাপাশি মুসলিমদেশগুলোতে ক্রমান্বয়ে আন্তর্জাতিক নারীবাদী ইউথ সংস্থাগুলোর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৫৮]

এমনকি কিছু কিছু নারীবাদী সংস্থা প্রতিষ্ঠাই হয়েছে ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য। উদাহরণস্বরূপ Women living under muslim laws নামক সংস্থাটির কথা বলা যায়। এটি ১৯৮৪ সালে মরক্কো, সুদান, আলজেরিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইরান, মৌরিতানিয়া ও তানজানিয়া

---

৫৬. Building moderate muslim networks, p 83

৫৭. আল হারাকাতুন নিসাউইয়্যাহ ওয়া সিলাতুহা বিল ইস্তি'মার, পৃষ্ঠা ৮৯

৫৮. ১৯৪৫ সালে মিশরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিনতুন নাইল নামক সংস্থাটিও বৃটেন সরকারের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এবং তারা ব্রিটিশ ও আমেরিকান দূতাবাস থেকে নিয়মিত আর্থিক সহায়তা লাভ করত। বর্তমানে বৈদেশিক অর্থায়নের ব্যাপারটি আরও বিস্তর ও ওপেন সিক্রেটে পরিণত হয়েছে।
(আল হারাকাতুন নিসাউইয়্যাহ ওয়া সিলাতুহা বিল ইস্তি'মার)

থেকে মোট নয়জন নারী নিয়ে ফ্রান্সের মান্টপিলিয়ার শহরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিভিন্ন মুসলিম দেশের নারীদের সাথে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করা এবং নারীবাদী আন্দোলনকে সহায়তা করা সংস্থাটির লক্ষ্য। সংস্থাটি এই পর্যন্ত প্রায় ৭০ টিরও অধিক রাষ্ট্রের নারীদের সাথে নেটওয়ার্ক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এই নেটওয়ার্ক তৈরির পেছনে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম নারীদের ইসলামি শরিয়াহর ক্ষমতা ও অধীনস্থতা থেকে স্বাধীন করা। এজন্য তাদের বেশ কয়েকটি প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম একটি প্রকল্প ছিল, নারীদের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের তাফসির তৈরি করা। বিশেষত নারী-সংক্রান্ত আয়াতগুলোর নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করানো। কারণ তাদের মতে সালাফদের ব্যাখ্যাগুলো পুরুষবাদী ব্যাখ্যা। যেগুলো নারীদের ওপর বৈষম্য ও বন্দিত্ব চাপিয়ে দিয়েছে ইসলামের নামে (নাউজুবিল্লাহ)। সংস্থাটি বিভিন্ন সময় সেসব রাষ্ট্রের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ ও আংশিক অবরোধও তৈরি করেছে, যারা নারীবাদী সংস্থাগুলোর আহবানে সাড়া দেয়নি।[৫৯]

আন্তর্জাতিক নারীবাদী সংস্থাগুলোর এই বিস্তৃতি একবিংশ শতাব্দীতে এসে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শতাব্দীর শুরুতেই তারা বিভিন্ন দেশের নারীবাদী আন্দোলনগুলোর সাথে গভীর সম্পর্ক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এজন্য মুসলিম বিশ্বে এসব সেকুলার ওয়েস্টার্ন নারীবাদী আন্দোলনগুলোর ভ্রষ্টতা মুসলিমদের সামনে ব্যাপকভাবে প্রকাশ করতে হবে। এই সংস্থাগুলোই সমাজে মুসলিম তরুণ-তরুণীদের মাঝে ধর্মহীনতার নব্য স্রোত তৈরি করছে। দেখা যাবে এরা বহির্বিশ্বের সন্দেহভাজন বিভিন্ন সংস্থা থেকে নিয়মিত আর্থিক সহায়তা পেয়ে আসছে।[৬০]

বহিরাগত প্রভাব কখনোই রাষ্ট্রের ভেতরে এককভাবে পরিবর্তন সাধন করতে পারে না, যতক্ষণ না রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কোনো মাধ্যম ও সহযোগী পাওয়া যায়। বিভিন্ন ইউথ ও নারীবাদী সংস্থাগুলো হলো তাদের সেই সহযোগী। এই সংস্থাগুলোর সাথে রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, রাজনীতিবিদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরও দেখা যায়। এতে মুসলিম দেশগুলোতে শরিয়াহ আইনকে কোণঠাসা ও নেতিবাচক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়াটি খুব সুস্পষ্টভাবেই ফুটে ওঠে।

---

৫৯. শাবাকাতুল আমালিন নিসাউইয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১৩৩, ১৩৭, ১৪৯

৬০. আল উদওয়ান আলাল মারআতিল মুসলিমাহ ফিল মুতামারাতিদ দাওলিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৪২১

সংস্থাগুলো তরুণ-তরুণীদের মাঝে পশ্চিমা ধারণাগুলো চমকপ্রদভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর অন্যদিকে পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র তা বাস্তবায়নের জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামি শরিয়াহ ও নারী-অধিকারের ব্যাপারে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের অবস্থান ও মুসলিমদের দায়িত্ব

প্রথমত, র‍্যান্ড কর্পোরেশন নারী-অধিকারের কোনো গ্রহণযোগ্য, যৌক্তিক সংজ্ঞা উপস্থাপন করতে পারেনি। চাই সেটা নারীর ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট হোক কিংবা সমাজের উন্নতি-অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট হোক। নারী-অধিকার সংশ্লিষ্ট স্লোগানগুলোর পক্ষে অবস্থান নেওয়ার একমাত্র কারণ হলো পশ্চিমা স্বার্থ বাস্তবায়ন করা। ফলে তাদের মুখে এই কথা মানায় না যে, ইসলামি শরিয়াহ নারীর অধিকার খর্ব করেছে কিংবা ইসলামি শরিয়াহ নারীকে পিছিয়ে রাখছে। কারণ নারীর প্রকৃত অধিকার তারা কখনোই বাস্তবায়ন করতে চায় না; বরং নারীর প্রতি তাদের ব্যাপক আগ্রহের একমাত্র কারণ হলো, মুসলিমদের ভেতর পশ্চিমা স্বার্থ পাকাপোক্ত করা।

দ্বিতীয়ত, র‍্যান্ড কর্পোরেশনের (জাতিসংঘহ এই ধরনের বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর চরিত্রও এক) আলোচনার প্রধান চরিত্র হলো পলিসি মেকিং, অর্থাৎ নারী-অধিকার, স্বাধীনতা ও দায়িত্ব নিয়ে তুলনামূলক কোনো আলোচনা তাদের নেই। তারা কেবল কিছু এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য কিছু পলিসি নির্ধারণ করে দিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নারীর ব্যাপারে ইসলামি শরিয়াহর অবস্থান ও তার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে কোনো বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা তাদের আলোচনায় পাওয়া যায় না। ইসলামি শরিয়াহর এই বিধানটা কেন অন্যায় আর তাদের প্রস্তাবনাটা কেন ন্যায়—এসব প্রশ্নের কোনো সমাধান তারা দিতে পারবে না; বরং তারা যেটা করে সেটা হলো, ইসলামি শরিয়াহর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার জন্য মুসলিম তরুণীদের পলিসি ঠিক করে দেওয়া। সুতরাং র‍্যান্ড কর্পোরেশনসহ নারীবাদী সংস্থাগুলো কখনো বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা উপস্থাপন করে না; বরং তারা পূর্বনির্ধারিত কিছু উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য মুসলিমদের ওপর বিভিন্ন পলিসি চাপিয়ে দেয়

কিংবা মুখরোচক কিছু স্লোগানের আড়ালে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাদের লক্ষ্যটা হাতে ধরিয়ে দেয়। ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী মুসলিমরা যা করে, সেটা সঠিক নাকি বেঠিক—র‍্যান্ড কর্পোরেশনের মতো আধুনিক প্রাচ্যবাদী সংস্থাগুলোর কাছে এর পর্যালোচনা নেই। তাদের কথিত গবেষকদের মূল আগ্রহ হলো, তাদের চাহিদা মুসলিমরা কীভাবে বাস্তবায়ন করবে, সেই আলোচনা করা।

র‍্যান্ড কর্পোরেশন হলো আমেরিকার পলিসি মেকার থিঙ্কট্যাঙ্ক। যারা নারী-অধিকারকে একটি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে মুসলিম-সমাজে তাদের উপনিবেশবাদী স্বার্থ বাস্তবায়নের জন্য। আর সেই স্বার্থগুলো হলো, মুসলিম নারীদের বিভ্রান্ত করা, তাদের মাধ্যমে সমাজকে নষ্ট করা, ইসলামি শরিয়াহকে বিলুপ্ত ও বিকৃত করা এবং সেসব প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা, যেগুলো সমাজের নৈতিক স্থিতিশীলতা ও নারীর সম্মান-মর্যাদা সংরক্ষণ করতে পারে। র‍্যান্ড কর্পোরেশনও জানে যে, নারী-অধিকারের দাবির আড়ালে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, আমেরিকান পলিসি বাস্তবায়ন করা। এজন্য তারা আশঙ্কা করছে যে, মানুষ তাদের আসল রূপ জেনে যেতে পারে। যেমন আফগানে আমেরিকান আধিপত্য প্রতিষ্ঠা লাভের পর তারা নারী-অধিকারের নামে যেসব কার্যক্রম সেখানে পরিচালনা করে আসছিল, তার ব্যাপারে আশঙ্কা করে র‍্যান্ড কর্পোরেশন বলে, অবশ্যই আফগানের অধিকাংশ নারী-পুরুষ আমাদের কার্যক্রমের বিরোধিতা করবে। কারণ তারা নারী-অধিকারের ব্যাপারটিকে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার মনে করবে। অথচ এটি একটি অর্থনৈতিক ব্যাপার।[৬১]

নারী-অধিকার ও নারী-স্বাধীনতার নামে পশ্চিমা বিশ্ব আমাদের ওপর যে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, এটা একই সাথে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই। এই যুদ্ধে আমাদের পবিত্র শরিয়াহকে সংরক্ষিত রাখতে চাইলে এবং পুরো পৃথিবীকে আন্তর্জাতিক মানবরচিত জাহালাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আমাদের সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদানের মহৎ দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশেষত প্রত্যেক এমন স্লোগান ও কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে, যেগুলো বিকৃত নারী-অধিকার আন্দোলন, নারীবাদী সংস্থাকে ও নারী সংশ্লিষ্ট শরিয়াহ-অসম্মত দাবিকে জোরদার করতে পারে। কারণ আমরা যদি এসব স্লোগান ও কার্যক্রমের বিরুদ্ধে না দাঁড়াই, তবে দিনশেষে তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে

---

৬১. Women and nation building, p 132

এবং তারা আল্লাহর শরিয়াহকে অপসারিত করবে। এজন্যই মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ.

'বলে দাও, হে কিতাবিগণ! আল্লাহর পথে বক্রতা সৃষ্টির চেষ্টা করে মুমিনদের জন্য তাতে অন্তরায় সৃষ্টি করছ কেন, অথচ তোমরা নিজেরাই প্রকৃত অবস্থার সাক্ষী? তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন। হে মুমিনগণ! তোমরা যদি কিতাবিদের একটি দলের কথা মেনে নাও, তবে তারা তোমাদের তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় কাফির বানিয়ে ছাড়বে।'[৬২]

নিশ্চয় বান্দার জন্য ভয়াবহতার দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় ফিতনা হলো নারী-সংক্রান্ত ফিতনা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আমার পর পুরুষদের জন্য নারীর চেয়ে অধিক ক্ষতিকর আর কোনো ফিতনা রেখে যাইনি।[৬৩]

অন্য হাদিসে তিনি নারীদের থেকে সতর্ক থাকতে বলেছেন।[৬৪] কারণ পুরুষদের অন্তর নারীদের প্রতি ধাবিত থাকে এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণের জন্য উদগ্রীব থাকে।

মুসলিমদের জন্য উচিত হবে না, ফিকহের দুর্বলতম কিংবা অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত মত অনুসরণের মাধ্যমে কিংবা জমহুর উলামায়ে কেরামের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে পশ্চিমা স্বার্থ বাস্তবায়ন করা। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ.

---

৬২. সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৯-১০০

৬৩. বুখারি, হাদিস ৫০৯৬

৬৪. তিনি বলেন, তোমরা দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকো এবং নারীদের থেকেও বেঁচে থাকো। মুসলিম, হাদিস ২৭৪২

'হে মুমিনগণ! যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তোমরা যদি তাদের কথা মানো, তবে তারা তোমাদেরকে তোমাদের পেছন দিকে (কুফরের দিকে) ফিরিয়ে দেবে। ফলে তোমরা উল্টে গিয়ে কঠিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'[৬৫]

মুসলিম নারীদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু বোনদের তৎপর হওয়া উচিত, যারা ইলমি ও আদর্শিক যোগ্যতায় উত্তীর্ণ। এ সমস্ত বোনেরা মুসলিম তরুণীদের মাঝে ইসলামি শরিয়াহর বিধানগুলো আপসহীনভাবে হৃদয়ঙ্গম করে বোনদের সামনে তুলে ধরবেন। তারা প্রভাব বিস্তারকারী হবেন, প্রভাবিত হবেন না। তাদের বক্তব্য হবে সুস্পষ্ট, যেখানে থাকবে না পশ্চিমা সংস্কৃতির কাছে নতি স্বীকার। এর জন্য তারা পরিমিত পর্যায়ে সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমসহ বিভিন্ন প্লাটফর্ম ব্যবহার করবেন। নারীদের জন্য বিশেষ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে তার আওতায় নারী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স ও কর্মশালার আয়োজন করবেন।

৬৫. সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৯

জব সেক্টরে নারী

ইসলামি শরিয়াহ নারীর প্রতি সবচেয়ে দয়াশীল ও ফিতরাতবান্ধব নীতিমালা প্রদান করেছে। পরিপূর্ণ ঘরে থাকা অবস্থাতেও ইসলামি শরিয়াহ নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। এর জন্য তাকে বাইরের দুনিয়ার নাকানিচুবানি, কষ্ট-ক্লেশ, ব্যস্ততা ও পরিশ্রমের শিকার হতে হয় না।

ইসলামি শরিয়াহর পক্ষ থেকে পুরুষরা তাদের অধীনস্থ নারীদের ব্যয়ভার বহন করতে আদিষ্ট। তাদের প্রতি এই নির্দেশ অনুগ্রহ হিসেবে নয়; বরং আবশ্যিকতার জায়গা থেকে পুরুষরা নারীদের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে আদিষ্ট। নারীদের এই ব্যাপারে কোনো প্রকার খোঁটা কিংবা খোঁচা দেওয়ার অধিকার তাদের নেই। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

'প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খরচা দেবে আর যার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে, সে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তা থেকে খরচা দেবে। আল্লাহ যাকে যতটুকু দিয়েছেন, তার বেশি ভার তার ওপর অর্পণ করেন না। কোনো সংকট দেখা দিলে আল্লাহ তারপর স্বাচ্ছন্দ্যও সৃষ্টি করে দেবেন।'[৬৬]

---

৬৬. সুরা তলাক, আয়াত ৭

> পুরুষরা নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ (নারীদের জন্য) নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।[৬৭]

আবার নারীরা তাদের মালিকানাধীন অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে পরিপূর্ণ স্বাধীন। তারা বৈধ যেকোনো ক্ষেত্রে স্বীয় সম্পদ ব্যয় করতে পারবে।

শরিয়ানুসারে একজন নারীর প্রধান দায়িত্ব হলো, গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করা,[৬৮] পরিবার গড়ে তোলা, পরিবারের সদস্যদের দেখাশোনা করা এবং ঘরের ভেতরটাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা; এটাই একজন নারীর মূল পেশা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নারী তার স্বামীর ঘরের প্রতি দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।[৬৯]

তবে কোনো প্রয়োজন কিংবা কল্যাণের কারণে কোনো নারী চাকরি করতে বাধ্য হলে ইসলাম নারীকে তার অনুমোদন দিয়েছে। সাথে সাথে চাকরির জন্য কিছু শর্ত ও সীমাও বেঁধে দিয়েছে। যেন সেই নারীর দীন ও ফিতরাত সংরক্ষিত থাকে। যেমন অবশ্যই সেই কর্মটা নারীর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, কর্মক্ষেত্রে যাওয়া ও অবস্থানের সময় অবশ্যই তাকে শালীনতা, পর্দা, ইবাদাহ বজায় রাখতে হবে এবং ফ্রি-মিক্সিং ও পরপুরুষের সঙ্গ থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে, ফিতনা ও উত্তেজনাকর স্থান থেকে নিরাপদ থাকতে হবে এবং তার এই চাকরি পরিবারের দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টিকারী না হতে হবে।[৭০]

এজন্যই ইসলাম নারীদের জন্য সাধারণ নেতৃত্বকে নিষিদ্ধ করেছে। কারণ, নেতৃত্বদান তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং এই কাজ তার মূল দায়িত্বের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। তা ছাড়া নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাইরের তৎপরতাসমূহ পরিচালনার সময় তার পক্ষে ইসলামের আবশ্যকীয় বেশ কিছু বিধান পালন অসম্ভব হয়ে পড়ে। নেতৃত্বের সাধারণ দাবিই এমন যে,

---

৬৭. সুরা নিসা, আয়াত ৩৪

৬৮. সুরা আহযাব, আয়াত ৩৩

৬৯. বুখারি, হাদিস ৮৯৩; মুসলিম, হাদিস ৪৭২৪

৭০. নারীর কর্মের ব্যাপারে ফিকহি বিধান জানার জন্য এই বইটি দেখা যেতে পারে— কর্মজীবী নারী, ইসলাম কী বলে মূল : মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানী, আব্দুল্লাহ আল ফারুক অনূদিত

জনসাধারণের মাঝে বেশি বেশি যেতে হবে, নারী-পুরুষ সবার সাথে মিশতে হবে। অনুরূপ আরও জটিলতা আছে, যা নারীর দীন-বিধ্বংসী হতে পারে।[৭১]

নিশ্চয় ইসলাম নারী-পুরুষের দায়িত্ব ও কর্মের মাঝে পার্থক্যের সীমারেখা টেনে দিয়েছে। কিন্তু এর মাধ্যমে কখনোই ইসলাম নারীর মর্যাদাহানি করেনি। তার মানব প্রকৃতি ও যোগ্যতার ব্যাপারে তিরস্কারও করেনি। এই পার্থক্য কিংবা প্রভেদ নারী-পুরুষের সম্পূরক জীবনকে সহজ করার লক্ষ্যেই করা হয়েছে। এই পার্থক্যের ভিত্তি হলো, ইনসাফ এবং নারী-পুরুষের মাঝে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্য ও সক্ষমতার ভিন্নতা।

যারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও দায়িত্বে নারী-পুরুষের মাঝে সমতার বিধান করতে চায়, তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যে একই শরীরের প্রতিটি অঙ্গের দায়িত্ব ও কর্মের মাঝে সমতার বিধান করতে চায়। উদাহরণস্বরূপ সে কোনো প্রকার প্রয়োজন ছাড়াই হাতকে হাঁটার সময় পা'কে সহযোগিতা করতে জোর করে, কিংবা চোখের ব্যাপারে আফসোস করে, কারণ সে শুনতে পায় না। আবার কানের ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করে, দেখতে না পারার কারণে। এভাবে সে মূলত নিজের অঙ্গগুলোকে উন্মাদনার দিকে ঠেলে দেয়। এটাকে জ্ঞানীরা পাগলামি ছাড়া কিছুই বলবে না।[৭২]

নারীর কর্মের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান মানব প্রকৃতি, নারীর সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বণ্টননীতির সাথে পরিপূর্ণ উপযোগী ও নিরাপত্তাশীল।

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের মতে, অধিক হারে নারীদের কর্মক্ষেত্রে যোগদান উন্নতি ও আধুনিকতার নিদর্শন।[৭৩] অপর দিকে কর্মক্ষেত্র থেকে নারীদের দূরে রাখার অর্থ হচ্ছে দেশের অর্ধেক জনশক্তিকে অকেজো করে রাখা।[৭৪]

---

৭১. আল মারআতু ওয়াল ওয়ালায়াতুস সিয়াদিয়্যাহ, আব্দুর রহমান বিন সাদ আশ শাশরী। এই গ্রন্থে নারী-নেতৃত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

৭২. আজনিহাতুল মাকরিস সালাসাহ, পৃষ্ঠা ৫৩২

৭৩. iran's political, demographic and economic vulnerabilities, rand 2008, p 111

৭৪. the united states, europe and the wider mider middle east, rand 2004,

এজন্য র‍্যান্ড কর্পোরেশন মুসলিম নারীদের অধিক হারে চাকরির বাজারে নিয়ে আসা এবং তাদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ঠেলে দেওয়ার প্রতি আগ্রহী। তবে মূল বাস্তবতা হলো, সংস্থাটির আগ্রহের জায়গা এটা না যে, নারীরা কাজ করুক এবং সম্মানজনক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি গড়ে তুলুক; বরং অধিক হারে নারীরা কর্মক্ষেত্রে আসার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সমাজে যেসব প্রভাব ও পশ্চিমা স্বার্থের বিস্তার দেখা যায়, সেগুলোই তাদের মূল আগ্রহের জায়গা। এজন্য সংস্থাটির কাছে 'নারীরা কাজ করছে' এই বাস্তবতার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তারা কী কাজ করছে, কোন সেক্টরে কাজ করছে এবং কেমন পরিবেশে কাজ করছে।

কাজের কাঙ্ক্ষিত ধরন ও সেক্টর

উইমেন এন্ড ন্যাশন বিল্ডিং রিপোর্টে র‍্যান্ড কর্পোরেশন নারীর কর্মের ব্যাপারে ২০০৪ সালে জাতিসংঘ তাদের ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে[৭৫] যে দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে এনেছিল, সেটাকেই চিহ্নিত করে। সেটা হলো, বেতনের পরিবর্তে নারীকে তার কর্মের ধরনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন ও সুগঠিতকরণ অধিক ফলপ্রসূ।[৭৬]

উক্ত রিপোর্টে সংস্থাটি পরামর্শ দেয়, ঐতিহ্যবাহী সেক্টরগুলোর বাইরে অন্যান্য সেক্টরগুলোতেও ব্যাপকহারে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করতে হবে।[৭৭]

এজন্য সংস্থাটি আফগান নারীদের প্রসিদ্ধ গালিচা-শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে সন্তুষ্ট নয়। তাদের মতে এই কাজ অনেক কষ্টের এবং এতে নারীরা স্বল্প পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে। এমনকি যদি অধিক পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তবুও তারা নারীর এমন কর্মের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে না পূর্বে উল্লেখিত মূল্যায়ন নীতি অনুযায়ী। তারা চায়, নারীরা পুলিশ হিসেবে কাজ করুক, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে যোগ দিক, পার্লামেন্টারিতে আসুক।[৭৮] খুবই হাস্যকর একটি ব্যাপার হলো, গালিচা-শিল্পকে তারা খাটুনিদায়ক কাজ হিসেবে চিহ্নিত করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করল।

---

p 102

৭৫. united nation development programme

৭৬. Women and nation building, p 102

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩০

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩১

পরক্ষণেই নারীদের পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীর চাকরিতে আগ্রহ ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করল। স্বভাবজাত দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কাজটা নারীর জন্য বেশি কষ্টের? গালিচা-শিল্পে কাজ করা নাকি পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীতে কাজ করা?

র‍্যান্ড কর্পোরেশন নারীদের যেসব সেক্টরে দেখতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তার মধ্যে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত সেক্টরটি হচ্ছে সাধারণ রাজনীতি, অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রিপরিষদ, সংসদ-সদস্যসহ রাজনৈতিক পদসমূহ।[৭৯]

সংস্থাটির কাছে নারীদের জন্য কাঙ্ক্ষিত ও গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি সেক্টর হলো বিচারবিভাগ। র‍্যান্ড কর্পোরেশন উইমেন এন্ড ন্যাশন বিল্ডিং রিপোর্টে আফগান নারীদের পরামর্শ দিয়ে বলে, সমস্ত নারীবাদী সংগঠনগুলোর জন্য উচিত হলো, নারীদের বিচার ও আইনি সেক্টরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমন্বিতভাবে কাজ করা। কারণ এর মাধ্যমেই জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কোনো কিছু আরোপ করা সম্ভব। কেবল সহযোগিতা ও দাবি উত্তোলন করার মাধ্যমে নয়; বরং উক্ত সেক্টরগুলোতে সরব উপস্থিতির মাধ্যমে এই দাবির বিষয়টিকে জোরদার করতে হবে। যেন অন্যান্য নারীরাও এ পথে আসতে সাহস পায়।[৮০]

নারীদের বিচারবিভাগে অন্তর্ভুক্তির প্রতি র‍্যান্ড কর্পোরেশনের আগ্রহের পেছনে বিশেষ কারণ আছে। তারা এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিভিন্ন আইন ও বিধান পরিবর্তন এবং সংশোধনের দাবি অত্যন্ত কার্যকরভাবে তুলতে পারবে।

সমস্ত উলামায়ে কেরাম খলিফা কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়াকে শর্ত করেছেন। তারা সকলেই একমত যে, নারীর জন্য রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া বৈধ নয়।[৮১]

জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের রায় হলো, নারীর জন্য বিচারক ও সাধারণ নেতৃত্বের কোনো পদে অধিষ্ঠিত হওয়াও বৈধ নয়।[৮২] কারণ মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ.

---

৭৯. Building moderate muslim networks, p 50, 68

৮০. Women and nation building, p 80

৮১. গিয়াসুল উমাম, ৮২ পৃষ্ঠা; আল ইরশাদ, ৩৫৯ পৃষ্ঠা; শরহুস সুন্নাহ, ১০/৭৭; আল আহকামুস সুলতানিয়াহ, পৃষ্ঠা ২৫-২৭

৮২. শরহুস সুন্নাহ, ১০/৭৭, শুয়াইব আরনাউতের তাহকিককৃত নুসখা; তাফসিরে কুরতুবি, ১/১৮৭

'পুরুষ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।'[৮৩]

আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সে জাতি কখনো সফল হবে না, যে জাতি তাদের দায়িত্বের ভার একজন নারীর হাতে ছেড়ে দিয়েছে।'[৮৪]

তা ছাড়া খুলাফায়ে রাশেদিন ও তাদের পরবর্তী সালাফদের কেউই কোনো নারীকে কোনো অঞ্চলের বিচারক কিংবা শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেননি। কারণ একজন বিচারকের জন্য পুরুষদের সাথে নিয়মিত ওঠাবসা করা জরুরি। অথচ নারীদের এ ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা তৈরি হতে পারে।[৮৫]

নারীরা সাধারণত সূক্ষ্ম-অনুভূতি ও আবেগসম্পন্ন হয়। তারা সামান্যতেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এ গুণগুলো মাতৃত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক হলেও নেতৃত্ব, বিচারব্যবস্থা ও জাতি পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর।[৮৬] মোটকথা, নারীর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য, উল্লিখিত পদগুলোর দায়িত্ব ও নারীর প্রতি শরিয়াতের অন্যান্য বিধানের বিবেচনায় ইসলাম নারীকে বিচারক কিংবা সাধারণ নেতৃত্বের বৈধতা দেয়নি।

আফগানে যেসব নারী কৃষি ক্ষেত্রে জড়িত, তাদের একটা বড় অংশকে অন্যান্য সেক্টরে বের করে নিয়ে আসার জন্যও র‍্যান্ড কর্পোরেশন তৎপরতার কথা বলেছে। র‍্যান্ড কর্পোরেশন উইমেন এন্ড ন্যাশন বিল্ডিং রিপোর্টটি প্রস্তুত করার সময় আফগানিস্তানের প্রায় ৮০ ভাগ নারী কৃষিকাজে জড়িত ছিল। কৃষির মতো একটি উৎপাদনশীল কাজে নারীদের ভূমিকা নিয়ে সংস্থাটি সন্তুষ্ট না। এর বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, তাদের দৃষ্টিতে কৃষিশিল্পে নারীদের অংশগ্রহণ একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী পেশা। এজন্যই আফগান নারীরা রক্ষণশীলতার সাথে এই সেক্টরে কাজ করছে। কিন্তু র‍্যান্ড কর্পোরেশনের দৃষ্টিতে নারীদের উচিত আধুনিক হওয়া এবং আধুনিক সকল সেক্টরে অংশগ্রহণ করা; বিশেষত

---

৮৩. সুরা নিসা, আয়াত ৩৪

৮৪. সহিহুল বুখারি, হাদিস ৪৪২৫

৮৫. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২/৫৬৪; আল আহকামুস সুলতানিয়াহ, পৃষ্ঠা ৮৩

৮৬. আল উদওয়ান আলাল মারআহ ফিল মুআতামারাতিদ দাওলিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৩৮৬

পুলিশ, পার্লামেন্টারি, বিচারবিভাগ, বিভিন্ন কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা। র‍্যান্ড কর্পোরেশন কেনই-বা এমনটা কামনা করবে না! এ সেক্টরগুলোতে নারীদের আনার মাধ্যমেই তো ফ্রি-মিক্সিংয়ের পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব। যে ফ্রি-মিক্সিংয়ের ছোবলে মুসলিম-সমাজ ও ইসলামি শরিয়ার বলয়কে দুর্বল করা খুবই সহজ।

দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ হলো, কৃষিশিল্পে কর্মরত নারীরা সাধারণত রাজনীতি ও সাংবিধানিক ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের স্বার্থ বাস্তবায়নে কাজ করতে পারবে না। অথচ এই দুটি সেক্টর র‍্যান্ডের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি সেক্টরকে কাজে লাগিয়েই র‍্যান্ড ইসলামি শরিয়াহর বাস্তবায়নকে অনিশ্চিত করতে চায় এবং মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমাদের বিশ্বাস ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এবং তারা এ কাজে যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিয়েছে।

সুতরাং র‍্যান্ড কর্পোরেশন চায় মুসলিম নারীদের বিভিন্ন সেক্টরে ঠেলে দিয়ে নিজেদের আদর্শিক ও রাজনৈতিক উপনিবেশ নিশ্চিত করতে। তারা নারীদের এমন সব ক্ষেত্রে অধিক হারে নিয়ে আসতে চায়, যেগুলোকে ইসলামি শরিয়াহ উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য কিংবা অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে অনুমোদন দেয় না। ইসলাম-সমর্থিত সামাজিক ঐতিহ্য ও প্রথাও সেগুলোকে নিষিদ্ধ বিবেচনা করে।

নারীর কাজের পরিবেশ

র‍্যান্ড কর্পোরেশন মুসলিম নারীদের কাজের জন্য চাকরির বাজারে ঠেলে দিতে চায়, একই সাথে তারা এটাও কামনা করে যে, তাদের কর্মক্ষেত্র যেন ফ্রি-মিক্সিং তথা নারী-পুরুষ সংমিশ্রিত পরিবেশ হয়। বস্তুত নারীর কর্মের ক্ষেত্রে ফ্রি-মিক্সিং তাদের একটি কাঙ্ক্ষিত মৌলিক বিষয়। এজন্য র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের উইমেন এন্ড ন্যাশন বিল্ডিং রিপোর্টে আফগান নারীদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা ও স্বনির্ভরতার সামনে পথের কাঁটা হিসেবে নারীর চলাফেলার ওপর শরিয়াহ কর্তৃক বিধিনিষেধ প্রদানকে দায়ী করেছে। সেই বিধিনিষেধগুলো হলো, মাহরাম ছাড়া চলাফেরা না করা, ফ্রি-মিক্সিং-এর পরিবেশ এড়িয়ে চলা, অভিভাবকদের সম্মতি নিয়ে বাইরে যাওয়া ইত্যাদি। ফলে কোনো নারী নিজে বিক্রিযোগ্য পণ্য উৎপাদন করে নিজে তা বিক্রি করতে পারে না; বরং একজন পুরুষকে বিক্রির দায়িত্ব দিতে

হয়।[৮৭] পাশাপাশি রিপোর্টটিতে নারীদের বাজারে যাওয়া ও পুরুষের সহযোগিতা ছাড়া নিজেই সব ধরনের কাজের ব্যাপারে স্বনির্ভর করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর কথাও বলা হয়েছে।[৮৮]

যদি কাজের পরিবেশের ব্যাপারে আফগানের সামাজিক কাঠামো নিয়ে আপত্তি তোলা হয়, তাহলে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে সেখানে নারীদের জন্য আলাদা ব্যবসায়িক মার্কেট তৈরি করে নারী-অধিকারকে বাস্তবায়ন করতে হবে। সাথে সাথে এ প্রচেষ্টাও থাকতে হবে, যেন ধীরে ধীরে এই পার্থক্য কমতে থাকে এবং নারী-পুরুষ একসাথে মাঠপর্যায়ে কাজ করতে পারে।[৮৯]

র‍্যান্ড কর্পোরেশন উপরোক্ত পলিসি বাস্তবায়নের জন্য আফগানিস্তানে ঘটা একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। যেখানে ধীরে ধীরে ফ্রি-মিক্সিং-এর ব্যাপারটি গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। ২০০৪ সালে NSP (National solidarity programme) এর পক্ষ থেকে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।[৯০] কর্মশালায় নারী-পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করে এবং প্রথম দুইদিন তাদের জন্য পৃথক পৃথক বসার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তৃতীয় দিন নারী-পুরুষ সকল কর্মীদের একসাথে বসার নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং দায়িত্বশীল একজনের বক্তব্য উল্লেখ করা হয় যে, এই বিষয়টি বড় কোনো পরিবর্তন আনবে না। তবে এর মাধ্যমে সবাই শিখতে পারবে যে, নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কীভাবে একসাথে কাজ করতে পারে।[৯১]

এ ঘটনা উল্লেখের পূর্বে র‍্যান্ড কর্পোরেশন রিপোর্টটিতে NSP এর একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছে। সেটা হলো, NSP এর কার্যক্রম থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, দীনি ও সামাজিক মাপকাঠিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই জেন্ডার ইকুয়ালিটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব।[৯২] প্রকৃতপক্ষে এটি সুস্পষ্ট ভ্রান্তি ও অসম্ভব বিষয়। কারণ

---

৮৭ . Women and nation building, p 89

৮৮ . প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৩

৮৯ . প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩২

৯০ . এটি বিশ্বব্যাংক ও অমুসলিম কিছু রাষ্ট্রের অর্থায়নে ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা। যারা আফগান সমাজকে গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়ন করার জন্য কাজ করত।

৯১ . Women and nation building, p 112

৯২ . প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৯

পশ্চিমা জেন্ডার ইকুয়ালিটি (নারী পুরুষের সমতা) নীতি ইসলামের নীতিমালার সাথে পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক। শরয়ি কিছু ইবাদাত, আজর-আজাব ও মনুষ্যত্বের জায়গা ছাড়া ইসলাম সার্বিকভাবে নারী-পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করে না। ইসলাম ন্যায়ের ধর্ম, সাধারণ সমতার নয়। কারণ সাধারণ সমতা অন্যায় ও জুলুমের অপর নাম মাত্র।

র‍্যান্ড কর্পোরেশন ফ্রি-মিক্সিংকে জেন্ডার ইকুয়ালিটির একটি প্রতীক হিসেবে দাবি করে। এটি ইসলাম ও বিভিন্ন মুসলিম দেশের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক বিষয়। ইসলাম সুস্পষ্টভাবে ফ্রি-মিক্সিংকে হারাম করেছে। মহান আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতম স্ত্রীদের ব্যাপারেই নির্দেশনা দিয়েছেন যে, যখন তোমরা তাদের কাছে কিছু চাইতে যাবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাবে। এটি তোমাদের ও তাদের সকলের অন্তরের জন্যই পবিত্রময়।[৯৩]

সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে অক্ষুণ্ণ রেখে কথিত জেন্ডার ইকুয়ালিটি বাস্তবায়নের দাবি সম্পূর্ণ অমূলক। মূলত তারা মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার জন্য প্রাথমিকভাবে এ ধরনের কথাবার্তা বলে। কিন্তু যখন তারা সমাজের গভীরে চলে যাবে এবং সমাজও তাদের আদর্শের গভীরে ডুবে যাবে, তখন তারা তাদের আসল চেহারা প্রকাশ করবে। সেটা হলো, জেন্ডার ইকুয়ালিটি পাশ্চাত্য সভ্যতা কিংবা ধর্মের একটি মৌলিক আকিদা বা বিশ্বাস। যা কিছু এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাংঘর্ষিক হবে, তা কোনো প্রকার যুক্তিতর্ক ছাড়াই প্রত্যাখ্যাত হবে। সেটা ইসলামের অকাট্য বিধান কিংবা জনগণের ঐতিহ্যবাহী কোনো সংস্কৃতিই হোক না কেন।

র‍্যান্ড কর্পোরেশন নারীর চলাফেরার ওপর শরিয়াতের যেসব বিধিনিষেধের দিকে ইঙ্গিত করেছে, যেমন মাহরাম ছাড়া সফর না করা, ফ্রি-মিক্সিং না করা, এগুলো মোটেও নারীর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। ইসলাম এ বিধানগুলো নারীর নিরাপত্তা ও উপকারার্থেই প্রদান করেছে। অনেক পুরুষ তাদের সকল কাজ নিজে সম্পাদন করে না; বরং অনেক কাজ তারা দায়িত্বশীল কর্মী নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে করে। তা সত্ত্বেও তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। এমনকি অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের অর্থনৈতিক সকল কার্যক্রম ইন্টারনেটের

---

৯৩. সুরা আহযাব, আয়াত ৫৩

মাধ্যমে পরিচালনা করছে। সুতরাং ফ্রি-মিক্সিং করতে না পারা, মাহরাম ছাড়া সফরে বের না হতে পারা, এগুলো কখনোই অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার প্রতিবন্ধক নয়। র‍্যান্ড কর্পোরেশনের এমন দুর্বল দাবির মধ্য দিয়ে তাদের আড়ালের উদ্দেশ্যটা আরও সুস্পষ্ট হয়। সেটা হলো, পশ্চিমা সভ্যতাকে মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। নারীর অধিকার আদায় কিংবা উন্নতি সাধনে তারা মোটেও সৎ নয়।

সামাজিক গঠন ও রাষ্ট্রীয় গঠন এবং দীনের জন্য ফ্রি-মিক্সিং খুবই ধ্বংসাত্মক একটি বিষয়। ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ফ্রি-মিক্সিংয়ের বিস্তার সমাজের সকল অনিষ্টের মূল। জমিনে আল্লাহর সাধারণ আজাব নেমে আসার অন্যতম কারণ ফ্রি-মিক্সিং। সাথে সাথে সমাজের সাধারণ থেকে বিশেষ সকল বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ারও একটি কারণ ফ্রি-মিক্সিং। এর মাধ্যমে সমাজে ব্যাপকহারে অশ্লীলতা ও যিনা ছড়িয়ে পড়ে। যদি দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা বুঝতে পারত যে, এটা দীনের পাশাপাশি সমাজ ও সমাজের লোকদের জন্য কতটা ক্ষতিকর, তবে তারা কঠোরভাবে ফ্রি-মিক্সিংকে নিষিদ্ধ করত।'[৯৪]

ফ্রি-মিক্সিং ও নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন সভ্যতার পতনেরও একটি মৌলিক কারণ। ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত যে, গ্রীক সভ্যতার পতনের অন্যতম একটি কারণ ছিল নারীদের খোলামেলা চলাফেরা, সৌন্দর্য প্রদর্শন ও ফ্রি-মিক্সিং। রোম সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও এই বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছে।[৯৫]

ডক্টর সুলাইমান আল ইদি খুব চমৎকার কথা বলেছেন। সামরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় উপনিবেশই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মুসলিম দেশগুলোতে ফ্রি-মিক্সিং ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জোর চেষ্টা চালিয়েছে। এর পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামি সমাজের মৌলিক কাঠামোকে ধ্বংস করা, মুসলিম-সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করা এবং মুসলিম-সমাজকে নিজেদের অনুগত বানিয়ে তার ওপর ইসলামবিরোধী সকল চিন্তাধারা ও প্রথা চাপিয়ে দেওয়া। কারণ সমাজ, পরিবার ও মুসলিমদের ব্যক্তিত্ব নষ্ট করার ক্ষেত্রে ফ্রি-মিক্সিং ভয়াবহ প্রভাব ফেলে।

---

৯৪. আত তুরুকুল হিকমিয়্যাহ ফিস সিয়াসাতিশ শারইয়্যাহ, দারু আলামিল ফাওয়ায়িদ, ২/৭২২

৯৫. আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন, পৃষ্ঠা ১৮৭

এমনকি ফ্রি-মিক্সিংয়ের দিকে আহবান ও ইহুদিবাদী জায়োনিস্ট আন্দোলনের মধ্যেও গভীর সম্পর্ক আছে। তাদের অন্যতম একটি পরিকল্পনা ছিল, যৌনতা, পর্নোগ্রাফি ও চারিত্রিক বিকৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামি সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া।[৯৬] এজন্য ২০০২ সালে ইসরাইলি সৈন্যরা যুদ্ধ চলাকালে ফিলিস্তিনে রামাল্লার সকল মিডিয়া স্টেশন দখল করে নেয় এবং প্রত্যেক চ্যানেলে একযোগে পর্নোগ্রাফি প্রোগ্রাম সম্প্রচার করে।[৯৭]

পৃথিবীর ঐতিহাসিক ধারা, মুসলিম উলামায়ে কেরামের বক্তব্য ও পশ্চিমা কিছু গবেষকদের দাবি এই ব্যাপারে নিশ্চিত বার্তা দেয় যে, নারীদের অবাধ চলাফেরা ও ফ্রি-মিক্সিং রাষ্ট্রের অনেক সামাজিক সমস্যার জন্য দায়ী। এমনকি বিভিন্ন প্রকার শাস্তির সম্মুখীন হওয়া ও সভ্যতায় পঁচন ধরার ক্ষেত্রেও ফ্রি-মিক্সিং ভয়াবহ ভূমিকা রাখে। সুতরাং মুসলিমদের উচিত নয় প্রাচ্যবাদী কিংবা পশ্চিমা কিছু সংস্থার আহবানে সাড়া দিয়ে ফ্রি-মিক্সিংয়ে জড়ানো। এরা কখনো আমাদের কল্যাণ চায় না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْيُضِلُّوْنَكُمْ.

'আহলে কিতাবদের একদল চায় তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে।'[৯৮]

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের পুরো রিপোর্ট থেকে এই কথা বারবার সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রকৃতপক্ষে নারী-অধিকারের কোনো মূল্য তাদের কাছে নেই। 'নারী-অধিকার' এই কথাটিকে তারা কেবল একটি সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করেছে। আর এই সাইনবোর্ডের আড়াল থেকে তারা নারীদের উন্মুক্ত বাজারে ছেড়ে দিয়ে সমাজে যৌনতাকে উস্কে দিতে চায়। নারীদের ভোগ্যপণ্য বানিয়ে সমাজে যৌনবিপ্লবকে সফল করতে চায়। যেন নারী-পুরুষ উভয়কেই যৌনতায় উন্মাদ রেখে লিবারেলিজম, ফেমিনিজমের মতো পশ্চিমা ধর্মে খুব সহজেই দীক্ষিত করতে পারে। আমরা দেখেছি, তারা নারীদের জন্য এমন কোনো কর্মপদ্ধতির প্রস্তাব রাখেনি, যেটা তাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের সাথে মানানসই হবে, যেই পদ্ধতি ও পরিবেশ তাদের দীন, সম্মান ও পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ রাখবে।

---

৯৬. দুয়াতুল ইখতিলাত ফিল মুজতামায়ী মিন মানজুরিল ফিকরিল ইসলামিয়্যিল মুয়াসিরি, ৫৬৬-৫৬৭

৯৭. https://bit.ly/3GnK5UV

৯৮. সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৯

পক্ষান্তরে ইসলামি শরিয়াহ নারীর মানবিক বৈশিষ্ট্য, তার যোগ্যতা ও মর্যাদার স্পষ্ট স্বীকৃতি দেওয়ার পর তার স্বভাব-প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দিয়েছে এবং তার এই স্বভাব-প্রকৃতি জীবনের কোন কোন কাজ বা কর্মক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত তা সুনিপুণভাবে নির্ণয় করেছে। অতঃপর যে কাজ বা কর্মক্ষেত্র তার স্বভাব-প্রকৃতির পরিপন্থি ও অনুপযোগী, কিংবা সমাজে তার স্বভাবসুলভ ভূমিকা পালনের পথে অন্তরায়, সেই কাজ ও কর্মক্ষেত্র থেকে তাকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রেখেছে। এই কারণেই পুরুষের তুলনায় তার ওপর কিছু কাজের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছে, আবার কিছু দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দিয়েছে।[৯৯]

ইসলামি শরিয়াহ যখন নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়েছে তখন তার উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত মহৎ ও পবিত্র। হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তোষামোদ কিংবা নারীত্বকে শোষণ ও ব্যবহার করার নোংরা মানসিকতা তার ছিল না। অথচ গ্রীক, রোমান ও আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা তাকে যত্রতত্র বিচরণ, অবাধ মেলামেশা ও ঢলাঢলিতে নামিয়ে দিয়েছে। উদ্দেশ্য, তার নারীত্বকে নষ্ট করা ও ভোগ করা এবং তাকে রাজনৈতিক ও উপনিবেশের স্বার্থ বাস্তবায়নের হাতিয়ার বানানো। তার অধিকার ও মর্যাদার প্রতি স্বীকৃতি দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

পক্ষান্তরে ইসলাম ঠিক এর বিপরীত ভূমিকা পালন করেছে। ইসলাম নারীর জন্য সেই বিধানই দিয়েছে যা তার যথার্থ মর্যাদা নিশ্চিত করে। ইসলাম পুরুষের সাথে মেলামেশা ও সভাসমিতিতে বিচরণের ব্যাপারে নারীর ওপর কঠোরতা আরোপ করেছে। কেননা ইসলাম চায় পরিবার ও সমাজের কল্যাণ সাধন করতে, নারীর ইজ্জত-সম্ভ্রমকে নিরাপদ ও তার নারীত্বকে শোষণমুক্ত করতে।

এজন্য মুসলিম নারীদের উচিত বিশ্বের সকল নারীর সামনে গর্ববোধ করা। কারণ তার অনুসৃত ইসলামি শরিয়াহ ও সভ্যতা দুনিয়ার সকল আইন ও সভ্যতার তুলনায় তাকে সবার আগে নিঃস্বার্থভাবে অধিকার প্রদান করেছে এবং তার মনুষ্যত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে। আর এই অধিকার ও স্বীকৃতি দিতে গিয়ে ইসলাম তার নারীত্বের বিন্দুমাত্র অবমাননা করেনি এবং তাকে কোনো স্বার্থ কিংবা জোরজবরদস্তির কালিমাও স্পর্শ করেনি।[১০০]

---

৯৯. আর মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন, দারুস সালাম, পৃষ্ঠা ৩০
১০০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩২

নারীর কাজের ব্যাপারে র‍্যান্ডের অবস্থান ও তার পর্যালোচনা

র‍্যান্ড কর্পোরেশন নারীর চাকরি ও তার উপকারিতা-অপকারিতা নিয়ে দলিলভিত্তিক কোনো পর্যালোচনা দিতে পারেনি। (প্রতিটি সংস্থাই এরকম) বরং তাদের বক্তব্যগুলো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সাথে মিলে যায়। তারা চায়, তাদের পলিসিগুলো যেন রাজনীতিবিদ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো গ্রহণ করে নেয়। মুসলিম নারীদের কর্মের ব্যাপারে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের দৃষ্টিভঙ্গি জাতিসংঘের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন কিছু নয়। সূচনালগ্ন থেকেই জাতিসংঘ নারীদের অত্যন্ত নেতিবাচকভাবে ব্যবহার করে আসছে।

কোনো প্রকার শর্ত ও বিধি ছাড়াই র‍্যান্ড নারীদের যেভাবে চাকরির বাজারে নেমে আসার জন্য আহবান জানিয়েছে, এটা কখনো বস্তুনিষ্ঠ কোনো রিপোর্ট ও গবেষণাধর্মী কাজ হতে পারে না। তারা তাদের গবেষণায় নারীর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্বের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করেনি। একজন নারী সর্বপ্রথম ঘরে রাণী এবং শিশুদের কোমল পাঠশালা। এ দায়িত্বই তাদের স্বভাবজাত মৌলিক দায়িত্ব। এ বাস্তবতাকে ভুলে যাওয়ার ভান করে কোনো গবেষণাই একাডেমিক মানে উত্তীর্ণ হতে পারবে না। সে গবেষণা নিশ্চিতভাবেই নারীর ওপর, শিশুদের ওপর ও পুরো সমাজের ওপর জুলুম চাপিয়ে দেবে।

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের পুরো রিপোর্টে নারী-সংক্রান্ত সমস্যাগুলো নিয়ে একাডেমিক কোনো পর্যালোচনা নেই, নেই বস্তুনিষ্ঠ কোনো আলোচনা। পুরো রিপোর্টে তারা নির্দিষ্ট কিছু সংশয়, দাবি ও পলিসি মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। আরও পরিষ্কার করে বললে, তারা সেই পুরোনো মদই নতুন বোতলে মুসলিমদের গিলাতে চেয়েছে। উপনিবেশ আমলে পশ্চিমা বিশ্ব যেসব সংশয় মুসলিম নারীদের উদ্দেশ্যে আমদানি করেছে, সেগুলোই র‍্যান্ড গবেষণার নামে বুদ্ধিজীবী ভাব নিয়ে পলিসি হিসেবে উপস্থাপন করেছে। প্রাচীন সেই ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্যগুলোই তারা বর্তমান যুগের ভাষায় তুলে ধরেছে। পাশাপাশি সেগুলো বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা এবং সেটা দূরীকরণের পন্থাও বাতলে দিয়েছে।

মূলত আধুনিক প্রাচ্যবাদ তার পুরো কার্যক্রমে প্রাচীন অসৎ প্রাচ্যবিদদের ওপরই নির্ভরশীল। ইসলামি শরিয়াতের বিরুদ্ধে পশ্চিমের বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল কেন্দ্রবিন্দু একই। কালের পরিক্রমায় প্রয়োজন অনুপাতে তারা কেবল সেই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পলিসি গ্রহণ করে।

নারীর কর্মের ব্যাপারে র‍্যান্ড কর্পোরেশন মোটাদাগে যেই দাবিগুলো যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছে, সেগুলো হলো—

১. অর্থনৈতিকভাবে নারীসমাজকে এড়িয়ে গেলে দেশের অর্ধেক জনসম্পদকে নষ্ট করা হয়।

গৃহস্থলের পরিবেশে নারীর কর্মের মাধ্যমে কখনোই অর্থনীতিতে নারীকে পশ্চাতে ফেলে রাখা হয় না এবং এর মাধ্যমে দেশের অর্ধেক জনশক্তি নষ্টও হয় না; বরং একজন নারী পারিবারিক পরিবেশে থেকে দেশের জনশক্তিকে প্রস্তুত ও শাণিত করে তোলে। নারীর এই ভূমিকা খুবই প্রাণবন্ত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা দেশের পূর্ণ জনশক্তিকে উৎপাদনশীল ও গঠনমূলক করে তোলে। যদি কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীকে উৎপাদন সেক্টরে কাজে লাগিয়ে দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়, তবে নিশ্চিতভাবেই কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশনাকে তাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য হুমকি ছাড়া কিছুই মনে করবে না। এই নির্দেশনা মানতে গেলে প্রতিষ্ঠান নিমিষেই ক্ষতিগ্রস্ত ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কারণ উৎপাদনের জন্যও একটি অগ্রগামী টিম থাকতে হয়, যারা বিভিন্ন পরিচালনা পর্ষদকে দেখভাল করবে। যেমন : হিসাব বিভাগ, প্রচারণা বিভাগ, মার্কেটিং বিভাগ, কাঁচামাল বিভাগ, শ্রমিক বিভাগসহ অনেক সেক্টরে কাজ করতে হয় একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে। আর পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকেও বেশি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ । পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে বস্তুগত সহায়তার পাশাপাশি মানসিক ও অনুভূতিগত প্রতিপালন ও সহায়তার প্রয়োজন হয়। যা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনায় নেই; বরং শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরাও উক্ত সহায়তাগুলো পারিবারিক প্রতিষ্ঠান থেকেই আহরণ করে থাকে।

সুতরাং পারিবারিক প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেশের পুরো জনশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর সকল নারীকে বস্তুগত উৎপাদনে নামিয়ে আনা মূলত পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার নামান্তর। একটি শিল্পকারখানা ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা বিলুপ্ত হওয়ার চেয়ে পারিবারিক প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সমাজ ও সভ্যতার জন্য বেশি বিপজ্জনক। উপার্জন ও পরিবারের বস্তুগত প্রয়োজন পূরণ পুরুষের দায়িত্ব, আর ঘর ও পরিবারকে ভেতর থেকে প্রতিপালন করা নারীর দায়িত্ব। এই দায়িত্ব বণ্টননীতি যদি সংরক্ষিত রাখা যায়, তবে সমাজ আল্লাহর ইচ্ছায় একটি

শক্তিশালী, উৎপাদনশীল ও গঠনমূলক প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে পারবে। এই সুষম দায়িত্ব বণ্টননীতি সমাজের বর্তমান ভারসাম্যকে বজায় রাখবে এবং ভবিষ্যতের উপার্জনকে নিশ্চিত করবে। আর যদি এই দায়িত্ব বণ্টননীতি লঙ্ঘন করা হয়, তাহলে সমাজ ও সভ্যতার বিদ্যমান ভারসাম্য নষ্ট হবে এবং তার ভবিষ্যতের ওপরও বিরাট নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

আবার যদি কোনো প্রতিষ্ঠানকে তাদের বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের দায়িত্বের মাঝে অদলবদল করতে বলা হয় এভাবে যে, প্রত্যেক বিভাগই বিরতি দিয়ে দিয়ে একে অপরের বিভাগের দায়িত্ব পালন করবে। অর্থাৎ এ সপ্তাহে যারা উৎপাদন বিভাগে কাজ করেছে তারা আগামী সপ্তাহে মার্কেটিং সাইটে কাজ করবে। আবার যারা মার্কেটিং সাইটে ছিল তারা উৎপাদন বিভাগে চলে আসবে। এভাবে প্রতিটি সেক্টরের কর্মীরা দায়িত্ব অদলবদল করবে। এ ব্যবস্থাপনাকেও প্রতিষ্ঠানটি ক্ষতিকর ও হুমকি হিসেবে দেখবে। প্রত্যেক বিভাগের কর্মীদেরই নির্দিষ্ট কিছু যোগ্যতা আছে, যেটা স্ব স্ব বিভাগের জন্য উপযোগী। অন্য কোনো বিভাগের জন্য সেসব দক্ষতা উপযোগী নয়। ফলে কর্মীদের যখন তাদের উপযুক্ত কর্মস্থল থেকে বের করে ভিন্ন কোনো ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হবে, তখন প্রতিষ্ঠানটি কয়েক দিনেই লস প্রজেক্টে পরিণত হবে।

কোনো বিবেকবান ব্যক্তি এই ধারণা করতে পারে না যে, নারীরা কর্মের জন্য ঘর থেকে বের হলেই দেশের পুরো জনশক্তি জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে একযোগে তৎপর থাকবে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বর্তমান সময় অধিকাংশ যুবক ও পুরুষ বেকার ঘুরছে। তাদের কেউ কেউ পরিপূর্ণ বেকার, কেউ কেউ আবার তার যোগ্যতার সাথে উপযোগী কর্মক্ষেত্র খুঁজে পাচ্ছে না। এই বাস্তবতা বোঝার জন্য কোনো পরিসংখ্যানের প্রয়োজন নেই। খালি চোখেই বিবেকবানরা এই সত্য প্রত্যক্ষ করতে পারবে। কর্মের ময়দানটা স্বভাবজাতভাবে পুরুষদের এক্টিভিটি প্লেস। যখন থেকেই এখানে নারীরা এসে ভিড় করছে, তখন থেকেই পুরুষদের মধ্যে বেকারত্ব অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাথে সাথে পারিবারিক ও নারী-সংক্রান্ত সমস্যাগুলোও ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে।[১০১]

---

১০১. আর মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন, ১১২-১২৪ পৃষ্ঠা

২. র‍্যান্ড কর্পোরেশন মনে করে, নারীর আয়ের অর্থ পরিবারের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় বেশি উপকারিতা সাধন করতে পারে।[১০২]

প্রথমত, বিভিন্ন পরিসংখ্যান র‍্যান্ডের দাবির উল্টোটা প্রমাণিত করে। একাডেমিক কয়েকটি গবেষণা দাবি করেছে যে, নারীর কর্মের কষ্টের তুলনায় পরিবার তার আয় থেকে খুব কমই উপকৃত হয়। মিশরের গবেষণা প্রতিষ্ঠান আল মারকাযুল কওমিয়্যু লিল বুহুসিল ইজতিমাইয়্যাহ তাদের এক গবেষণায় জোর দিয়ে বলেছে যে, নারীর আয়ের সর্বোচ্চ ১৮% অর্থ থেকে পরিবার উপকৃত হতে পারে। অবশিষ্ট আয় তার পোশাক, সাজসজ্জা, জুতা, পরিবহন খরচ ও কর্মজনিত নানান চাহিদাতেই ব্যয় হয়ে যায়।

কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিভাগের শিক্ষক ড. হাদী মুখতার তার এক গবেষণায় দেখিয়েছে যে, নারীর উপার্জনের বড় অংশই সামাজিক প্রদর্শনীতে চলে যায়।[১০৩]

দ্বিতীয়ত, ধরে নেওয়া হলো যে, নারীর আয়ে পরিবারের কিছুটা লাভ হয়। কিন্তু তার আয়ের উপকারিতার চেয়ে সে ঘর থেকে বের হওয়ার কারণে সৃষ্ট ক্ষতিটা আরও বড় এবং মারাত্মক। সন্তানদের অবহেলা করা, মায়ের যথার্থ প্রতিপালন থেকে সন্তান বঞ্চিত হওয়া, সংসারের ব্যাপারে উদাসীনতা, পারিবারিক দায়িত্ব পালনে শিথিলতা, নিজে ফিতনার সম্মুখীন হওয়া ও অন্যকে ফিতনার সম্মুখীন করাসহ বিভিন্ন দীনি, রাজনৈতিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলোর সামনে উল্লেখিত নগণ্য উপকার কিছুই না। তা ছাড়া ইসলামি ফিকহের একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো, অকল্যাণ দূরীভূত করা কল্যাণ লাভের ওপর প্রাধান্য পাবে।[১০৪]

এই পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সমস্ত তথ্য-উপাত্ত প্রমাণ করে যে, নারীদের ঘর থেকে বের হওয়া চরিত্র নষ্টের পাশাপাশি পরিবার বিরান হওয়া, পরিজন নষ্ট হওয়া, ভালোবাসা ও দয়া কমে যাওয়ার অপর নাম।[১০৫]

---

১০২. Women and nation building, p 5; afganistan : state and society, p 50

১০৩. মাজাল্লাতুল উসরাহ, সফর ১৪২৩ হিজরি, পৃষ্ঠা ১৮-২০

১০৪. আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, পৃষ্ঠা ৮৬

১০৫. নিহায়াতুল মারআতিল গরবিয়্যাহ বিদায়াতুল মারআতিল আরাবিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৫

নারীরা ঘর থেকে বের হওয়ার কারণে পশ্চিমা সমাজ যেই নরকীয় অবস্থায় পতিত হয়েছে, তা সম্পর্কে স্বয়ং অনেক পশ্চিমা গবেষকই মুখ খুলেছে।

ব্রিটিশ গবেষক স্যামুয়েল স্মেইল বলেন, 'যেই ব্যবস্থা নারীকে কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত রাখে, দেশের শিল্পবিপ্লবের জন্য আমাদের দেশে সেই ব্যবস্থার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। এর ধ্বংসাত্মক এক পরিণতি হলো, পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাওয়া। কারণ এই ব্যবস্থা পারিবারিক কাঠামোতে আঘাত হানে, এর ভিত্তিসমূহকে ভেঙে দেয় এবং পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। বিশেষ করে এই ব্যবস্থার একমাত্র পরিণতি হলো, নারীর নৈতিকতা ও চরিত্রকে হীন করে দেওয়া। একজন নারীর প্রধান ও প্রকৃত দায়িত্ব হলো, পরিবারকে ঠিক রাখা।'[১০৬]

অর্থনীতিবিদ জাওল সিমন বলেন, 'নারীরা এখন অনেক কিছুই করছে। সরকার তাদেরক কারখানাতেও নিয়োগ দিয়েছে। এভাবে তারা সামান্য কটা পয়সা আয় করতে পারছে বটে, কিন্তু এর বিনিময়ে তারা পরিবারের ভিত্তি ধ্বসিয়ে দিয়েছে।'[১০৭]

নিশ্চয় ইসলামি শরিয়াহ নারী-পুরুষের অধিকার ও দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে ন্যায়ের মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত এক সমাজব্যবস্থা। নারী-পুরুষের সত্তা ও সমাজের কল্যাণ ইসলামের বিধিবিধানে পূর্ণ বিবেচনা পেয়েছে। দায়িত্বের এমন বণ্টন পরিবার ও সমাজের জন্য আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত। এর মাধ্যমেই পরিবার ও সমাজ একটি ভারসাম্যপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ জীবন লাভ করতে পারে।

৩. র‍্যান্ড কর্পোরেশন মনে করে, নারী সদস্যের উপস্থিতি পুলিশি শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বন্দী নারীদের পর্যবেক্ষণ, নারী অপরাধীদের অনুসন্ধানের মতো কাজের জন্য নারী-পুলিশ প্রয়োজন। র‍্যান্ড কর্পোরেশনের পরিতাপ হলো, আফগান নারীরা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ে কিংবা স্থানীয় পুলিশ বিভাগেও ব্যাপকভাবে সকল পদে জায়গা করে নিতে পারেনি। কারণ আফগান সরকার ও সমাজ এর বিরোধী।[১০৮]

র‍্যান্ডের এই বক্তব্য স্ববিরোধী। বক্তব্যের প্রথম অংশের সাথে দ্বিতীয় অংশের

---

১০৬. আর মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন, পৃষ্ঠা ১৭০
১০৭. আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন, পৃষ্ঠা ১১৮
১০৮. Women and nation building, p 31

বিরোধ আছে। যদি নারীবিষয়ক নিরাপত্তার জন্যই নারী পুলিশের প্রয়োজন হয়, তাহলে ব্যাপকভাবে সকল সেকশনে তাদের অংশগ্রহণের দরকার কী? প্রয়োজনীয় সেক্টরে প্রয়োজন অনুপাতে নারী সদস্য থাকাই কি যথেষ্ট নয়?

ইসলামি শরিয়াতে নারীদের সাধারণভাবে সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া আছে। এটা ইসলামি শরিয়াতের পক্ষ থেকে নারীদের প্রতি বিশেষ রহমত। এমনকি ইসলাম নারীদের জন্য জিহাদকেও ফরজ করেনি। কেবল জিহাদ যখন ফরজে আইন হয় তখন নারীদের ওপর দায়িত্ব আসে। নারীর শারিরীক, মানসিক ও স্বভাবজাত গঠন সামরিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত নয়। বিশেষত আধুনিক সেনাজীবনে তো নয়ই। এই সেনাজীবন ইসলামি নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয় না। নারীদের মূল কর্তব্য হলো, তারা আড়ালে থাকবে এবং পুরুষদের সাথে মেলামেশা বর্জন করবে। আর যুদ্ধের ময়দান কিংবা আধুনিক সমর কাঠামোতে এটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান যুগে নারীসেনার যেই কাঠামো—ইসলাম এর অনুমোদন দেয় না। কেননা এই কাঠামো ফ্রি-মিক্সিংকে আবশ্যক করে। তা ছাড়া সালাফদের ইতিহাসে ব্যাপকভাবে নারী বাহিনী গঠনের কোনো নজিরও পাওয়া যাবে না। এটি সম্পূর্ণ নব্য আবিষ্কৃত বিষয়।[১০৯]

নারী বন্দিদের পর্যবেক্ষণ, নারী অপরাধীদের অনুসন্ধানসহ নারী সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ নারী টিম গঠন করার বৈধতা আছে। তবে সেটা অবশ্যই শরিয়াতের অন্যসব নীতিমালা মেনে এবং প্রকৃত প্রয়োজন অনুপাতে হতে হবে।

৪. র‍্যান্ড কর্পোরেশনের আরেকটি হাস্যকর দাবি হলো, পুলিশ বাহিনী ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসহ যেকোনো প্রতিষ্ঠানে নারী সদস্যদের উপস্থিতি পরিচালনাগত নৈরাজ্যকে কমিয়ে আনে।[১১০]

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারী সদস্যদের উপস্থিতি ও তার অবস্থা সম্পর্কে যার ন্যূনতম জ্ঞান আছে, সে বুঝতে পারবে এই দাবি কতটা হাস্যকর ও অবাস্তব। পরিচালনাগত নৈরাজ্য সাধারণত অন্যান্য কিছু বিষয়ের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর সাথে নারীর অনুপস্থিতির তেমন সম্পর্ক নেই; বরং দেখা যায়, নারীর উপস্থিতির কারণেই অনেক ক্ষেত্রে পরিচালনাগত নৈরাজ্য দেখা যায়। বিশেষত

---

১০৯. আত তামাইযুল আদিলু বাইনার রজুলি ওয়াল মারআতি ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩৩১

১১০. Women and nation building, p 5

পুলিশ বিভাগে এই নৈরাজ্যের সংখ্যা আরও বেশি। যেখানে উপরস্থ কর্মকর্তারা নিম্নস্তরের কর্মকর্তাদের ওপর কর্তৃত্ব খাটায়।

সেই ১৯৭৫ সালেই ওয়াশিংটন পোস্ট কিছু রিপোর্ট প্রকাশ করে। যেখানে বলা হয়, স্বয়ং জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রকরা পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত নারীদের যৌন নির্যাতন করে। যদিও নারী-পুলিশ সদস্য একদিনের জন্য তাদের যৌন লিপ্সায় অসম্মতি জানায়। মহিলা পুলিশদের একটি সমিতির কাছে জানতে চাওয়া হলে তারা জানায়, তারা প্রায় সকলেই তাদের উচ্চপদস্থ নেতাদের পক্ষ থেকে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়েছে।[১১১], [১১২]

যদিও র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের দাবির পক্ষে কিছু অসৎ ও মেকি রিপোর্ট দেখিয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ একাডেমিক রিপোর্টই তাদের বিরুদ্ধে। যেই রিপোর্টগুলো প্রমাণ করে যে, নারীর উপস্থিতির কারণে পরিচালনাগত নৈরাজ্য কমে না; বরং কখনো কখনো বৃদ্ধি পায়। [১১৩]

---

১১১. আমালুল মারআতি ফিল মিযান, ১৮৪

১১২. সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের যৌন হয়রানি নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। রিপোর্টির নাম 'সেট দ্যা স্ট্যান্ডার্ড'। এতে বলা হয়েছে, নারী কর্মচারীদের ৫১% নারীই কোনো না কোনোভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। (https://bbc.in/3DGuPRn)

২০১৬ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ২০৫০০ টি যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটে আমেরিকান মিলিটারি ফোর্সে। এর মধ্যে ১৩০০০ হাজার নারী এবং ৭৫০০ জন হলো পুরুষ। (https://bit.ly/32Z3CMR)

বাংলাদেশেও ৪০% নারী-পুলিশ কর্মকর্তা কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার হয়। (https://bit.ly/3GgM1OU)

পুরো বিশ্বেই কর্মক্ষেত্রে নারীদের যৌন হয়রানির শিকার মারাত্মক রূপ লাভ করেছে। বাড়ছে অবৈধ সম্পর্ক, পরকীয়া, ধর্ষণ, পরিবার ভাঙন ও হত্যার ঘটনা। নারীদেরকে পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে কর্মক্ষেত্রে টেনে আনার এটাই আবশ্যিক ফল।

১১৩. বাংলাদেশের প্রায় ৬০ শতাংশ নারী-পুলিশ যৌন হয়রানির শিকার। সূত্র : https://bit.ly/3vxrYaQ

ইউরোপীয় দেশগুলোতে এই হার আরও বেশি। তা ছাড়া কর্মক্ষেত্রের অধিকাংশ নারীই কোনো-না-কোনোভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়। কিন্তু নারীরা বিভিন্ন ভয় কিংবা আশায় এই হয়রানিগুলোর কথা প্রকাশ্যে বলতে পারেন না। এবং পাবলিক প্লেস ও কর্মক্ষেত্রগুলোতে যৌন হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ড একটি ওপেন সিক্রেটে পরিণত হয়েছে। আর ফ্রি-মিক্সিং পরিবেশের নিশ্চিত ফলাফল হলো, সমাজে যৌনতাকেন্দ্রিক অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়া ও চরিত্র ধ্বংস হওয়া।

মূলত নারীর কর্মের ব্যাপারে র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের উইমেন এন্ড ন্যাশন বিল্ডিং নামক রিপোর্টে যেসব দাবি করেছে, তার সবগুলোই অত্যন্ত দুর্বল ও অবাস্তব; বরং প্রতিটি দাবিই ঔপনিবেশিক পলিসি বাস্তবায়ন ও মুসলিম-সমাজকে পাশ্চাত্যকরণের জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তৈরি করা হয়েছে। এই ধরনের রিপোর্টকে কখনো বস্তুনিষ্ঠ ও একাডেমিক বলা যায় না; বরং এটি বিষাক্ত প্রাচ্যবাদী গবেষণার দৃষ্টান্ত।

উপরন্তু নারীর কর্মের ব্যাপারে এমন কিছু বাস্তবতা আছে যেগুলো র‍্যান্ড এড়িয়ে গেছে। কিন্তু পশ্চিমা কিছু সংস্থাই সেসব বাস্তবতার কথা স্বীকার করেছে। এর মধ্যে একটি বাস্তবতা হলো, ব্যাপকভাবে নারীদের কর্মক্ষেত্রে আসা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও কমিয়ে আনার একটি মাধ্যম। জাতিসংঘের অধীনে কর্মরত প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স প্রোগ্রাম (NIP) দাবি করেছে যে, কাজের জন্য নারীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সাথে জনসংখ্যার হার কমার সম্পর্ক আছে। যখনই কর্মশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে তখনই জনসংখ্যা কমতে শুরু করেছে। এর কারণ হলো, নারীদের পরিবার থেকে অমনোযোগী করে চাকরি ও বাইরের ক্যারিয়ারমুখী করে দেওয়ার কারণে তারা সংসার গঠন ও বিয়ে করতে বিলম্ব করছে। দেখা গেছে বর্তমানে দেশে শিক্ষিত ও কর্মজীবি নারীদের বিয়ের গড় বয়স ২৮-৩০। বিয়ের পরও সন্তান গ্রহণের প্রতি এক প্রকার অনীহা কাজ করছে এসব কর্মজীবি নারীদের ভেতর। ফলে একদিকে বয়স বাড়ার সাথে তাদের সন্তান জন্মদানক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে চাকরি ও সংসারের ঝামেলা থেকে বাচতে সন্তান নিতেও অনীহাবোধ করছে। যা আশংকাজনকভাবে জনসংখ্যার হারে নিম্নমুখী প্রভাব ফেলছে।

গণতন্ত্র ও নারীর মাঝে সম্পর্ক

র‍্যান্ড কর্পোরেশন কর্তৃক কথিত নারী-অধিকারকে মুসলিম দেশগুলোতে বাস্তবায়ন করার পলিসি মূলত ডেমোক্রেটিক ও লিবারেল মূল্যবোধকে মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার একটি মূল অনুষঙ্গ। এমনকি র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের একটি রিপোর্টে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে।[১১৪]

আমেরিকাসহ ইউরোপিয়ানদের মুখে বারবার নারী-অধিকারের দাবি উচ্চারিত হওয়া লিবারেল মতাদর্শ ছড়ানোরই একটি বাহন। যেমন : সমতা, টলারেন্স (সহনশীলতা), মাল্টিকালচারালিজম (বহুসংস্কৃতিবাদ), আন্তর্জাতিক হিউম্যান রাইটস (মানবাধিকার)-এর প্রতি সম্মান ইত্যাদি লিবারেল সংস্কৃতির বিষয়গুলো তারা মুসলিম দেশগুলোতে কথিত নারী অধিকারের স্লোগানের আড়ালে বিস্তার করছে।

কট্টর ইসলাম কিংবা ইসলামি শরিয়াহর পুরানো ব্যাখ্যা প্রসারের বিরুদ্ধে নারীদের ভূমিকা পালনের জন্য র‍্যান্ড কর্পোরেশন বিভিন্ন দেশের কিছু মুসলিম নারীকে আইডল হিসেবে দেখিয়েছে। এমনকি তারা পরিকল্পিত ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সেসব নারীকে গাইডিং করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে, যেন তারা (তাদের ভাষায়) কট্টরপন্থি ইসলাম ও তার আবদ্ধ ব্যাখ্যার স্রোতকে থামিয়ে দিতে পারে। ফলে মুসলিম দেশগুলোতে (শরিয়াহ) সংস্কার আন্দোলনে নারীদের সহায়তা করা তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে।[১১৫]

---

১১৪. Building moderate muslim networks, p ৫০

১১৫. প্রাগুক্ত, ৮০ পৃষ্ঠা

এমনকি রিপোর্টটিতে উপনিবেশিত এলাকা ফিলিস্তিনের ব্যাপারে গৃহীত একটি প্রকল্পের জায়োনিস্ট পরিচালিকার মন্তব্যও বিবৃত হয়েছে। প্রকল্পটির নাম হলো, 'গণতান্ত্রিক রূপান্তর ও নারীর প্রতি ইনসাফ'। তার বক্তব্য হলো, নারী কেবল সাংস্কৃতিক ও গণতান্ত্রিক পরিবর্তনেরই প্রধান মাধ্যম নয়; বরং কোনো প্রকার সামাজিক আন্দোলনের অনুপস্থিতিতেও এককভাবে তারা সিভিল সোসাইটি (সভ্যসমাজ) গঠন ও ধারাবাহিক সংশোধনকে বাস্তবায়ন করতে পারে।[১১৬]

একটি নারীবাদী সংস্থার গবেষকও নারীদের এই দায়িত্বের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে স্বীকার করেছে। বৈশ্বিকভাবে নারীবাদীদের ওপর চালানো চারটি গবেষণার একটিতে সে বলেছে, জাতীয় পর্যায়ের নারীবাদী নেটওয়ার্কগুলো পলিসি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর স্বয়ংসম্পূর্ণ বিকল্প হতে পারে। উক্ত গবেষক নারীবাদী নেটওয়ার্কগুলোর এই অবস্থানকে নারীদের রাজনৈতিক বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।[১১৭]

উক্ত নারী গবেষক আরও জানিয়েছে যে, বেশ কিছু নারীবাদী সংস্থা বৈশ্বিকভাবে পরস্পর নেটওয়ার্ক তৈরি করতে আরম্ভ করেছে। যেন তারা একে অপরকে সাহায্য করতে পারে, সম্মিলিত প্রচারণা চালাতে পারে ও রাষ্ট্রীয় পলিসির মাঝে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তারা নারীর সমতা, স্বনির্ভরতা ও সমাজকে গণতান্ত্রিক রূপায়নে পরস্পরকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করতে পারবে। নারীবাদী এই নেটওয়ার্কগুলো বৈশ্বিকভাবে বিস্তার লাভ করছে রাজনৈতিক হাতিয়ার ও পলিসি বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে।[১১৮]

র‍্যান্ড কর্পোরেশন মনে করে, যদি কোনো দেশে বেশ কিছু নারীপ্রার্থী তৈরি হয়ে যায়, তাহলে নতুন কোনো সরকার কিংবা পলিসি গঠনে তাদের ওপর আস্থা রাখা যাবে। তখন তারা রাষ্ট্রীয় পলিসিতে 'আলোকিত বিধান' প্রবেশ করিয়ে উপকৃত হতে পারবে।[১১৯]

আমরা জানি র‍্যান্ড কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম নারীদের ইসলামি

---

১১৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৩

১১৭. শাবাকাতুল আমালিন নিসাউইয়্যাতি মুতাআদ্দিয়াতিল কওমিয়্যাহ ফিস সাকাফাতিল আলামিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১৫২

১১৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৮

১১৯. Women and nation building, p 60

শরিয়াতের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়া এবং ইসলামি শরিয়াহ যেন বাস্তবায়িত না হতে পারে সে ব্যাপারে তাদের সোচ্চার রাখা। সুতরাং দেখাই যাচ্ছে আলোকিত বিধান দ্বারা কী বোঝানো হচ্ছে। ইসলামি শরিয়াহকে সরিয়ে তারা যেই বিধান আনতে চায়, সেটা জাহিলিয়াত ও অন্ধকারের বিধান। সেটা কখনো আলোকিত বিধান নয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> اَللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
>
> 'আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের অভিভাবক শয়তান, যে তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা সকলে অগ্নিবাসী। তারা সর্বদা তাতেই থাকবে।'[১২০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ.
>
> 'অথবা তাদের (কার্যাবলির) দৃষ্টান্ত হলো, গভীর সমুদ্রে বিস্তৃত অন্ধকারের মতো, যাকে আচ্ছন্ন করে ঢেউয়ের ওপরে ঢেউ এবং তার ওপর মেঘমালা। এভাবে স্তরের ওপর স্তরে বিন্যস্ত আধারপুঞ্জ। কেউ হাত বের করলে আদৌ তা দেখতে পায় না। বস্তুত আল্লাহ যাকে আলো দেন না, তার নসিবে কোনো আলো নেই।'[১২১]

আমেরিকার একটি মৌলিক স্ট্রাটেজি (কৌশল) হলো, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও শাসনকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া। এজন্য তারা গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে হিজাব, ফ্রি-মিক্সিং না মানা, ক্যামেরার সামনে না আসার মতো বিষয়গুলো মেনে নিতেও প্রস্তুত। যেমন

---

১২০. সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৭

১২১. সুরা নুর, আয়াত ৪০

র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে যে, আফগান নারীদের অধিক হারে গণতান্ত্রিক কার্যক্রমে নিয়ে আসার জন্য আমাদের যেই প্রচেষ্টা, সেখানে প্রাথমিকভাবে আমাদের সহজতা নিয়ে আসতে হবে। যেন তারা গণতান্ত্রিক কার্যক্রমে আসতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। যেমন তারা পুরুষদের থেকে পৃথকভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে, হিজাব পরিহিত থাকতে পারবে ইত্যাদি। অধিক হারে নারীদের রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কুরআন-হাদিস থেকে কিছু দলিল উপস্থাপন করতে হবে, স্থানীয় কিছু শায়খদের সমর্থন আদায় করতে হবে এবং ইসলামি শরিয়াহর কিছু মূলনীতিকেও এর পক্ষে ব্যবহার করতে হবে। এতে করে নারীদের অধিক হারে রাজনীতিতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ব্যাপক সমর্থন পাওয়া যাবে।[১২২]

উল্লিখিত পলিসিটি যদিও তাদের মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক, যেমনটা নারীর কর্ম সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনায় আমরা দেখেছি। নারীর কর্মের বিষয়ে তারা এমন সেক্টরসমূহ ও পরিবেশকে অগ্রাধিকার দেয়, যেগুলো মূলত ইসলামি শরিয়াহ সমর্থন করে না। তবে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের গবেষকদের প্রধান মনোযোগ হলো পশ্চিমা স্বার্থ। তাই এ ক্ষেত্রে যদি প্রাথমিকভাবে কম্প্রোমাইজ (আপস) করে ইসলামি শরিয়াহর কিছু বিধানকে মেনে নিতে হয়, তাহলে তারা সেটাতেও রাজি। কারণ তারা ভালো করেই জানে, দিনশেষে এটা পশ্চিমা স্বার্থকেই বাস্তবায়ন করবে। এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, পশ্চিমারা যখন মুসলিম নারীদের তাদের রবের দাসত্ব থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত করে দেবে, তাদের পূর্ণ মনোযোগকে কাজের ময়দানের দিকে ফিরিয়ে দেবে এবং তার সামনে নির্বাচন ও প্রদর্শনীর অসুস্থ সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেবে, তখন সে নিজ থেকেই ধীরে ধীরে শরিয়াতের বিধিমালা থেকে বেরিয়ে আসবে।

র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের উইমেন এন্ড ন্যাশন বিল্ডিং রিপোর্টে জাতিসংঘের ডেভেলপমেন্ট প্রোগাম থেকে নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার একটি মাপকাঠি উল্লেখ করেছে। যেটা দিয়ে মাপা যাবে, কোন দেশের নারীরা কতটুকু উন্নত ও স্বনির্ভর হয়েছে। সে মাপকাঠি হলো, পার্লামেন্ট, রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের পদবী ও পরিচালনাপর্ষদে শতকরা কত পার্সেন্ট নারী আছে।[১২৩]

---

১২২. Women and nation building, p 64, 117, 118, 127

১২৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫০

এমনিভাবে রিপোর্টটিতে তারা জাতিসংঘের ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের তৃতীয় উদ্দেশ্যের দিকেও ইঙ্গিত করেছে। সেটা হলো, নারী-পুরুষের মাঝে সমতা বাস্তবায়ন করা ও নারীকে স্বনির্ভর করা।[১২৪]

র‍্যান্ডের দৃষ্টিতে নারীর সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্কের সারাংশ

১. নারী ও নারী-অধিকার পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রূপায়নের একটি সোপান। (গণতান্ত্রিক রূপায়ন বলতে কেবল নির্বাচন ভোট নয়; বরং ইসলামি শরিয়াহর কর্তৃত্বকে নষ্ট করে মানুষের মাঝে পশ্চিমা সভ্যতার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা)।

২. মুসলিম দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের জন্য নারী জনগোষ্ঠী অন্যতম সহযোগী।

৩. নারী রাষ্ট্রের সংবিধান ও আইন প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক সংশোধনী সাধনের জন্য চাপ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী, যা পশ্চিমা স্বার্থের জন্য সহযোগী।

১২৪. Women and nation building, p 51

মুসলিম নারীদের পশ্চিমাদের কাতারে নেওয়ার জন্য আকর্ষণ করা

পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম-সমাজের এমন একটি উপাদান তালাশ করে, যা খুব দ্রুত তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে এবং তাদের বন্ধুত্বকে গ্রহণ করে নেবে। তারা দেখতে পেল, নারীরাই হলো সেই সহজ ও দ্রুতগামী উপাদান। এজন্য তারা মুসলিম দেশগুলোর নারীসমাজকে টার্গেট করল। যেন তৃণমূল পর্যায়ে নারীরা তাদের সহযোগী হতে পারে।

র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের পুরোনো এক রিপোর্টে আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের উপনিবেশ নিয়ে আলোচনা করেছে। রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছিল ডেভিড গ্যালোলা।[১২৫] সে ফ্রান্স উপনিবেশের একজন দায়িত্বশীল ছিল। আলজেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের নারী এবং আলজেরিয়ার অধিবাসীদের মাঝে থাকা তাদের মিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সে বলে, 'আমি বিশ্বাস করি, আলজেরিয়ার নারীরা যেই অনুগত জীবনযাপন করছে, আমরা যদি তাদের সেই জায়গা থেকে মুক্ত করতে পারি,

---

১২৫. ড্যাভিড গ্যালোলা ১৯১৯ সালে তিউনিসিয়ায় এক ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। এই লোক তখনকার সময় বেশ কিছু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। চীনে ফ্রান্স দূতাবাসে সামরিক এটাচি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এক সেনাদলের নেতৃত্ব ছিল তার হাতে। তাকে বিদ্রোহ দমনবিষয়ক গবেষক হিসবে গণ্য করা হয়। আলজেরিয়ার যুদ্ধের পর সে তার গবেষণা শেষ করার জন্য জাতিসংঘে সফর করে। র‍্যান্ড তাকে যুদ্ধ-সংক্রান্ত কিছু পলিসি গবেষনাকারে লিখে দিতে বলে এবং সে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের বেশ কিছু সেমিনারেও অংশগ্রহণ করে। ১৯৬৭ সালে সে মৃত্যুবরণ করে।

তাহলে নিশ্চিতভাবেই তারা আমাদের পক্ষে কাজ করবে। আমি সেনাবাহিনীর কমান্ডের কাছে একটি চিঠি লিখেছি। সেখানে আমি তাকে বলেছি, আলজেরিয়ান নারীরাই আমাদের সবচেয়ে প্রত্যাশিত সহযোগী।'[১২৬]

নারীদের সহযোগিতা লাভের ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন পলিসি দেখিয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো, নারীদের পুরুষদের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়া এবং নারী ও পুরুষের মাঝে মনস্তাত্ত্বিকভাবে একটি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা। পরস্পরের প্রতি এই বিরোধী মনোভাব তৈরি করতে পারলে খুব সহজেই নারীদের তারা নিজেদের দিকে ঝোঁকাতে পারবে।[১২৭]

ঠিক এই পরিস্থিতিটাই আজকে আমরা সমাজে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি। নারী-পুরুষ একে অপরের সহযোগী ও পরিপূরক না ভেবে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব আমাদের সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। সমাজ থেকে এই ঘৃণ্য মনোভাবকে দূর করতে হবে। এই ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়কেই ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ একদিকে কিছু পুরুষদের ব্রাহ্মণীবাদী আচরণ নারীদের জুলুমানা মানসিকতায় ভোগাচ্ছে। আর অন্যদিকে তাদের এই বিষণ্নতার সুযোগ নিয়ে পশ্চিমা নারীবাদী ও লিবারেল গ্রুপগুলো নারীদের দীনবিরোধী আদর্শের শিকার বানাচ্ছে।

নারীদের সহযোগী বানানোর ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদীদের আরেকটি পলিসি হলো, নারীদের বিভিন্ন সামাজিক ও চিকিৎসাকেন্দ্রিক সেবা প্রদান করা। এই ব্যাপারে ডেভিড গ্যালোলার অভিমত হলো, ফ্রান্সের একজন সেনাবাহিনী আলজেরিয়ার কোনো এক গ্রামের একজন বিধবা মহিলাকে খাবার দেয়। যার ফলে ওই নারী উক্ত গ্রামে আমাদের গুপ্ত সহযোগী হয়ে যায় এবং সে অনেক গুরুপূর্ণ তথ্য প্রদান ও গোপনীয় অনেক কাজ আমাদের করে দেয়।[১২৮]

র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের নারী-সংক্রান্ত রিপোর্টটিতে বলেছে, আফগানিস্তানে নারীদের কিছু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান আঞ্চলিকভাবে আমেরিকার জন্য বিভিন্ন সহায়তা লাভের ক্ষেত্রে বেশ কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। একাধিকবার সেবা গ্রহণকারী

---

১২৬. Pacification in Algeria, 1956-1958, rand 2006, p 105, 166

১২৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮০

১২৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯০-১৯১

নারীরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে এবং আমেরিকান শক্তিকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে তারা নিজেদের অবস্থান ব্যক্ত করেছে। তাদের কেউ কেউ আমাদের কাছে বিভিন্ন কৌশলগত তথ্যও শেয়ার করেছে।[১২৯]

ওপরের আলোচনা থেকে আমাদের সামনে যেই বিষয়টি ফুটে ওঠে সেটা হলো, বর্তমানে পুরো মুসলিম-সমাজ (এবং আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে) বিশেষত নারীসমাজের মাঝে ওয়ালা-বারা তথা আল্লাহর জন্য সম্পর্ক এবং আল্লাহর জন্যই সম্পর্কচ্ছেদ-এর বিশ্বাস অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে। আমরা যদি মুসলিম-সমাজে আকিদার এই পাঠকে শক্তিশালী করতে পারতাম, তবে পশ্চিমারা মুসলিমদের মাঝে প্রবেশের জন্য সহজ কোনো দরজা খুঁজে পেত না এবং মুসলিমদের মাঝে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ফাসাদ ছড়ানোর সুযোগও পেত না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদের জন্য (ঘর থেকে) বের হয়ে থাকো, তবে আমার শত্রুকে এবং তোমাদের নিজেদের শত্রুকে এমন বন্ধু বানিও না যে, তাদের কাছে ভালোবাসার বার্তা পৌঁছাতে শুরু করবে। অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তারা তা এমনই প্রত্যাখ্যান করেছে যে, রাসুলকে এবং তোমাদেরকেও কেবল এই কারণে (মক্কা হতে) বের করে দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো! অথচ তোমরা যা কিছু গোপনে করো এবং যা কিছু প্রকাশ্যে করো, আমি তা ভালোভাবে জানি। তোমাদের মধ্যে কেউ এমন করলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হলো।'[১৩০]

---

১২৯. Women and nation building, p 13

১৩০. সুরা মুমতাহিনা, আয়াত ১

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

'হে মুমিনগণ! ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই একে অন্যের বন্ধু! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদের হিদায়াত দান করেন না।'[১৩১]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

'আল্লাহ তোমাদের কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদের বের করার কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা জালিম।'[১৩২]

আল্লাহর জন্যই আন্তরিক সম্পর্ক এবং আল্লাহর জন্যই সেই সম্পর্কচ্ছেদের বিশ্বাস মুসলিম ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে পশ্চিমাদের সর্বপ্রকার আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য এক শক্তিশালী প্রাচীর হতে পারে। কারণ যে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর দীনের কল্যাণের ভিত্তিতেই সম্পর্ক করবে, সে কখনো ইসলামের শত্রুকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহায়তা করার মতো জঘন্য খেয়ানত করতে পারে না। যে কাফের, মুশরিক ও দীনের শত্রুদের প্রতি আন্তরিক সম্পর্ক রাখবে না, সে কখনো এমন কোনো বিষয় ও ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা করবে না, যেটা ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতির কারণ হবে। বারাআতের বিশ্বাস তাকে এই কাজ করতে বাধা দেবে।

---

১৩১. সূরা মায়েদা, আয়াত ৫১

১৩২. সূরা মুমতাহিনা, আয়াত ৯

বৈশ্বিক বিভিন্ন উদ্যোগ ও সংস্থা কর্তৃক সহায়তা

র‍্যান্ড কর্পোরেশন চেষ্টা করেছে মুসলিম বিশ্বে নারী বিষয়ে জাতিসংঘের কার্যক্রম যেন একটি স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে চলমান থাকে। হোঁচট খেয়ে যেন সেটা হুট করেই পরিবর্তন কিংবা বন্ধ না হয়ে যায় । তাদের নারীবিষয়ক প্রকল্প যেন রাজনৈতিক পরিধি পেরিয়ে একটি সামজিক আন্দোলনে রূপ নেয়। সাথে সাথে এই প্রকল্প যেন রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত না হয়ে আপন গতিতে চলমান থাকে। এতে করে তাদের এই প্রকল্প কোনো প্রকার সংবেদনশীলনতার শিকার না হয়েই মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা স্বার্থ বাস্তবায়নে সফল হবে।

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের সেই স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির পথে প্রথম পদক্ষেপ হলো, নারীবিষয়ক প্রকল্পকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও উদ্যোগের অধীনস্থ করে দেওয়া।

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের রিপোর্টের ভাষায়, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও উদ্যোগগুলোর প্রধান মিশন হলো, তারা একটি বহুমুখী আগ্রাসনে তাদের একক প্রচেষ্টা ব্যয় করবে। ইসলামি বিশ্বে পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে কোল্ড ওয়ারের[১৩৩] অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর প্রসঙ্গে বিল্ডিং মডারেট মুসলিম নেটওয়ার্ক নামক রিপোর্টে র‍্যান্ড কর্পোরেশন বিস্তারিত আলোচনা করেছে। সেখানে তারা বলেছে, জাতিসংঘ

---

১৩৩. কোল্ড ওয়ার বা স্নায়ুযুদ্ধ হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রসমূহ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রসমূহের মধ্যকার টানাপোড়েনের নাম। ১৯৪০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯৮০ এর দশক পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ছিল।

তাদের অধীন প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাকে তাদের উদ্দেশ্য ঠিক করে দেবে এবং বাহ্যিক প্রেক্ষাপট হতে দূরে থেকে তাদের লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়ে যাবে। এবং সংস্থাগুলোকে এমন অবস্থানে ছেড়ে দেবে, যেন জাতিসংঘের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া সংস্থাগুলো নিজেই পরিচালিত হবে এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে যাবে। র‍্যান্ড কর্পোরেশন এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছে যে, যদি জাতিসংঘ তাদের সাহায্যপ্রাপ্ত বন্ধুপ্রতিম সংস্থাগুলো থেকে দৃশ্যমান দূরত্ব বজায় রাখে, তবে তাদের তৎপরতা ও সফলতা আরও বৃদ্ধি পাবে।[১৩৪]

আন্তর্জাতিক এসব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর ভয়াবহতার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়, যখন এরা কোনো প্রকার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই মুসলিম দেশগুলোতে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। মুসলিম দেশগুলোতে স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠনকে তারা অত্যন্ত অভিনব ও সহনীয়ভাবে সরাসরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। জাতিসংঘ এই ক্ষেত্রে সরাসরি সাহায্য প্রদান থেকে বিরত থাকে; বরং তাদের সাহায্যপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলো নানান চুক্তির অধীনে কিংবা সরাসরি অনুদান দেওয়ার মাধ্যমে সেসব স্থানীয় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে থাকে, যারা নারীর ক্ষমতায়নসহ এই ধরনের মিশনগুলো নিয়ে কাজ করে। যেই মিশনগুলো মূলত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর এজেন্ডারও অন্তর্ভুক্ত।[১৩৫]

আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এক গবেষণায় ২০০৬ সালে র‍্যান্ড কর্পোরেশন উল্লেখ করে যে, অতি শীঘ্রই আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ইউএসএআইডি[১৩৬] দক্ষিণ এশিয়ায় নারীর ক্ষমতায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।[১৩৭]

---

১৩৪. তাকউইনু শাবাকাতিন মিনাল মুসলিমিনাল মুতাদিলিন, (আল মুলাখখাস) পৃষ্ঠা ৩

১৩৫. Building moderate muslim networks, p 57-58

১৩৬. US agency for international development। এটি আমেরিকান একটি এজেন্সি, বহির্বিশ্বে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা প্রদান করে থাকে। পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি স্বতন্ত্র, তবে এর পৃষ্ঠপোষকতায় আছে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ১৯৬১ সালে আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে এজেন্সিটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই এজেন্সিকে বহির্বিশ্বে আমেরিকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রভাবশালী ও সহযোগী মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশসহ এশিয়ার প্রায় সব দেশেই তাদের কার্যক্রম আছে।

১৩৭. War and escalation in south asia, rand 2006, p 4

বিল্ডিং মডারেট মুসলিম নেটওয়ার্ক নামক রিপোর্টে র‍্যান্ড কর্পোরেশন জানিয়েছে, MEPI[১৩৮] নামক সংস্থাটির মৌলিক চারটি ভিত্তির একটি হলো উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট (নারীর ক্ষমতায়ন)। আরব নারীদের নিয়ে ইতিমধ্যে তারা বেশ কিছু প্রজেক্ট বাস্তবায়নও করেছে। এর মধ্যে কিছু প্রজেক্টের উদ্দেশ্য ছিল মিশরে নারীদের জন্য বিশেষ বেসরকারি সংস্থাসমূহের নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করা, আর কিছু প্রজেক্টের উদ্দেশ্য ছিল নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট পরিবেশ ও সম্ভাবনাকে উন্নত করা।

রিপোর্টটিতে তারা কানতারা[১৩৯] নামক একটি সাইটের দিকেও ইঙ্গিত করে, যেটি জার্মান সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত হয়।[১৪০] সাইটটিকে নারী সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচকদের সমাবেশস্থল বলা যায়।[১৪১]

২০০৬ সালে বাহরাইন ইন্সটিটিউট ফর পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট[১৪২] ;

---

১৩৮. Middle east partnership initiative। সংস্থাটি ২০০২ সালে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ডেমোক্রেটিক, ইকোনোমিক ও এডুকেশনাল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য এটি একটি আমেরিকান উদ্যোগ। সংস্থাটি বহুত্ববাদী সমাজ গঠনের জন্য বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশগ্রহণমূলকভাবে কাজ করে এবং সেসমস্ত প্রজেক্টকে অর্থায়ন করে, যা গণতান্ত্রিক সংশোধনের জন্য গৃহীত হয়। স্থানীয় অংশীদারদের সাথে সরাসরি কাজ করার স্বার্থে সংস্থাটি দুটি প্রাদেশিক শাখাও খুলেছে। একটি আবুধাবিতে, অপরটি তিউনিসিয়ায়। প্রথম সাত বছরে তারা ১৭ টি দেশে দুইশরও বেশি প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করেছে।

১৩৯. www.qantara.de সাইটটি আরবি, ইংরেজি, জার্মান এই তিন ভাষাতেই রয়েছে এবং এতে দৈনিক সংবাদ, বিভিন্ন প্রবন্ধ ও পর্যালোচনা আছে।

১৪০. এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুভ ফাউন্ডেশনের কথা উল্লেখ করা যায়। এটি জার্মান খ্রিস্টান মিশনারি পরিচালিত তরুণদের নিয়ে চালিত বিশ্বব্যাপী একটি সামাজিক সংস্থা। যা বিশ্বের বেশ কিছু দেশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এই সামাজিক সংস্থা। বাংলাদেশে তারা ২০১৩ সালে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের দেশের মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করার নামে দীনি স্বকীয়তা ও বিবেচনাবোধ থেকে বের করে আনা এবং তাদের ব্যবহার করে দেশে পশ্চিমা মতাদর্শের ইসলামাইজেশন করা। তাদের সাইটের লিংক : https://www.move-foundation.com/

১৪১. Building moderate muslim networks, p 57, 59, 132

১৪২. ২০০৫ সালে বাহরাইনের রাষ্ট্রীয় নির্দেশনার মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাংবিধানিক মাজলিসে শুরার সাথে যুক্ত করা হয়। সংস্থাটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিস্তার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা।

ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইন্সটিটিউট[১৪৩]-এর মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এর কারণ ছিল, এনডিআই নামক আমেরিকান সংস্থাটি ডেমোক্রেসি প্রচার ও সদস্যদের প্রশিক্ষিত করার নামে বাহরাইনের কিছু সিভিল সোসাইটি সংস্থাকে অর্থায়ন ও পরিচালনা করছিল। এর মাঝে দুটি নারীবাদী সংস্থাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৪৪]

একটি আরবি গবেষণার বর্ণনানুসারে, বেসরকারি সংস্থাগুলো যেসব মিশন বাস্তবায়নে কাজ করছে, সেগুলো আরও বিস্তৃত করার জন্য ১৯৬৭ সালে সুস্পষ্ট নির্দেশনা জারি হয়। নির্দেশনাটি নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের বিশেষ ঘোষণা হিসেবে জাতিসংঘ থেকে প্রকাশিত হয়। জাতিসংঘ সেখানে বেসরকারি সংস্থাসমূহের অনুদানপ্রাপ্ত মিশনগুলো আরও বৃদ্ধি করার জন্য আহবান করে। তারা এ-ও উল্লেখ করেছে যে, বেসরকারি নারীবাদী সংস্থাগুলোই কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধনে সক্ষম। তারা সামাজিক প্রথা, দীনি মূল্যবোধ, স্থানীয় সংস্কৃতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মাধ্যমে এই পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে।[১৪৫]

পশ্চিমা উপনিবেশের সময় আমেরিকান বাহিনী, ন্যাটোর মতো সামরিক সংস্থাগুলো এসব আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। যেন সামরিক উপনিবেশের পর সংস্থাগুলো মুসলিম নারীদের জন্য মিশন নিয়ে বেসামরিকভাবে কাজ করতে পারে। পাশাপাশি সামরিক সংস্থাগুলোও এই মিশন নিয়ে কাজ করছে। এর মাধ্যমে তারা মূলত মুসলিম বিশ্বের ওপর সামরিক, রাজনৈতিক অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক উপনিবেশ কায়েম রাখছে।[১৪৬]

পশ্চিমা বিশ্বের মদদপুষ্ট ও তাদের সংস্কৃতি ধারণকারী আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো মুসলিম ও আরব বিশ্বের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি জাতিসংঘ ও তার শাখা সংস্থাগুলো ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ তৈরি করে যাচ্ছে। মানুষের খাদ্য, ওষুধ ইত্যাদি নিত্যকার প্রয়োজনীয়তার যেই সুযোগ তারা নিচ্ছে, নিশ্চয় সেটা

---

১৪৩ . এটি একটি বেসামরিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৩ সালে আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গণতান্ত্রিক সংস্থাসমূহকে শক্তিশালী করার জন্য এটি কাজ করে। ১২৫ টির মতো দেশে সংস্থাটির কার্যক্রম আছে।

১৪৪ . আল বাহরাইন : হাল আখতয়াত ফি ইগলাকিল মা'হাদিল আমরিকিয়্যি, ৮৩ পৃষ্ঠা

১৪৫ . উলামাতু কাওয়ানিনিল আহওয়ালিশ শাখসিয়্যাহ ফি মিশর, পৃষ্ঠা ৩৮

১৪৬ . Women and nation building, p 28

প্রতারণা ও উদ্দেশ্যমূলক সহমর্মিতা ছাড়া কিছুই না। মানুষের প্রয়োজনীয়তার সুযোগ নিয়ে তারা নতুন এক জীবনপদ্ধতি চাপিয়ে দিচ্ছে। সেই জীবনপদ্ধতি পশ্চিমা ও উপনিবেশবাদী স্বার্থ কায়েম রাখে। ইসলামের প্রায় সকল বিধানকে আঘাত করে। সেই সাথে মানুষের সকল ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রথাকেও ধ্বংস করে দেয়।

মুসলিম উম্মাহর উচিত, তাদের সেবাসংস্থাগুলোর ঐতিহ্যগত অবস্থানে ফিরিয়ে আনা; যার মাধ্যমে তারা মানুষকে সাহায্য ও সমাজকে উন্নত করতে পারে। মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব হলো, আন্তর্জাতিক এসব সংস্থা ও তাদের ইসলামি শরিয়াহবিরোধী এজেন্ডাগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তাদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা।

হিজাব

হিজাবের ব্যাপারে র‍্যান্ডের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম নামক রিপোর্টটিতে ফুটে উঠেছে, বিশেষ করে দ্বিতীয় পরিশিষ্টে। মুসলিম নারীদের হিজাব নিয়ে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত তিনটি পয়েন্টের মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে।

১. হিজাবের পরিচয় ও তার উদ্দেশ্য
২. বিভিন্ন দেশে হিজাব বিস্তারের পর্যবেক্ষণ
৩. কিছু পশ্চিমা দেশের মিডিয়াতে হিজাব পরিহিত নারীদের নিয়ে সমালোচনা।

হিজাবের পরিচয় ও তার উদ্দেশ্য

ইসলামি শরিয়াতে হিজাবের মর্ম হলো, আল্লাহর ইবাদাত পালনের নিমিত্তে নারী তার পুরো শরীর, চেহারা ও সৌন্দর্যকে গাইরে মাহরাম পুরুষ থেকে আবৃত করে রাখবে।[১৪৭] কিন্তু র‍্যান্ড কর্পোরেশন, বিশেষত শেরল বেনার্ডের কাছে হিজাব

---

১৪৭. মুখমণ্ডল ঢাকা নিয়ে পূর্ববর্তী ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। তবে পরবর্তী অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম মুখ ঢাকাকে আবশ্যক বলে মত দিয়েছেন এবং এটাই সবচেয়ে নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য মত। তা ছাড়া অধিকাংশ নারীই বাইরে বের হওয়ার সময় তাদের চেহারাকে আলাদাভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করে। তাদের জন্য মুখ খোলা রাখা কোনোভাবেই বৈধ হয় না। কারণ এই সৌন্দর্য সাধারণ প্রকাশিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না।
তবে হিজাবের ব্যাপারে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের যেই অবস্থান সেটা মুখ খোলা রাখা এবং মুখ ঢাকা উভয় অবস্থানের ক্ষেত্রেই সমান।

হলো, নির্দিষ্ট এক চিন্তা ও আদর্শের প্রতীক। ইহুদিদের টুপি কিংবা শিখদের পাগড়ীর সাথে এর তুলনা করা চলবে না। এই হিজাব কখনো বাক স্বাধীনতা ও বহুত্ববাদের মতাদর্শের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ তা কোনো নিরপেক্ষ জীবনপদ্ধতি ধারণ করে না। হিজাব একটি রাজনৈতিক নিদর্শন।[১৪৮] হিজাব কেবলই একটি সাংস্কৃতিক ও প্রথাগত বিষয়। এটি ইসলামি শরিয়াহ কিংবা দীনি প্রত্যাদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়।[১৪৯]

হিজাব রাজনৈতিক প্রকাশ ও নির্দিষ্ট চিন্তার প্রতীক–এর দ্বারা র‍্যান্ড কর্পোরেশন আসলে বোঝাতে চাচ্ছে যে, ইসলামি শরিয়াতে হিজাব গুরুত্বপূর্ণ কিংবা মৌলিক কোনো বিষয় নয়। এটা কেবল একটি প্রতীকী বিষয়। যা রাজনৈতিক স্বার্থ কিংবা ইসলামি দাওয়াহ প্রচারের ক্ষেত্রে সহযোগী হতে পারে।[১৫০] এই ধরনের বিভিন্ন অমূলক দাবির মাধ্যমে এরা নারীসমাজের ভেতর এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করার চেষ্টা করছে যে, হিজাব এমন কোনো বিষয় নয়, যার মাধ্যমে একজন নারী তার রবের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকে ও তার দাসত্ব বরণ করে নেয়। এটা কেবল সামাজিক সংস্কৃতির অংশ। এজন্য মুসলিম নারীদের জন্য হিজাব পরিধান না করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় কোনো সমস্যা নেই; বরং হিজাবকে উগ্রবাদী মুসলিমরা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। পশ্চিমা আরেক গবেষকের দাবি হলো, হিজাবের ব্যাপারে উস্কানি এবং এটাকে রাজনৈতিক প্রতীক বানানোর প্রজেক্ট মূলত উপনিবেশের প্রারম্ভে শুরু হয়েছে।[১৫১]

তবে ইউরোপের কিছু সেকুলার হিজাবকে দীনি বিষয়ের সাথেই সম্পৃক্ত করে। এজন্য ফ্রান্সের সংবিধান হিজাব, টুপিসহ সকল ধর্মীয় পোশাক ও নিদর্শনকে সমপর্যায়ের জ্ঞান করে। যার দরুন তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সেকুলার রাষ্ট্রের নীতি হিসেবে হিজাবকে নিষিদ্ধ করেছে।[১৫২] যেখানে র‍্যান্ড কর্পোরেশন ও শেরল

---

১৪৮. সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম, পরিশিষ্ট-২, পৃষ্ঠা ৬৭

১৪৯. radical islam in est africa, rand 2009, p 61 , the muslim world after 9/11, p 27

১৫০. The rise of political islam in turkey নামক রিপোর্টে র‍্যান্ড কর্পোরেশন হিজাবের ব্যাপারে তুরস্কে একটি সেকুলার গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করে। সেটা হলো, হিজাব হচ্ছে তুর্কি সমাজে ইসলামি দাওয়াহ বিস্তারের একটি প্রতীক। পৃষ্ঠা ৬১

১৫১. সিয়াসাতুল হিজাব, জন স্কট , পৃষ্ঠা ৮৩

১৫২. হিজাব পরিধান করার কারণে মুসলিম নারীদের হেনস্তার শিকার হওয়া ইউরোপসহ এখন

বেনার্ডের প্রচেষ্টা হলো, হিজাবকে অন্যান্য দীনি ড্রেস থেকে ভিন্ন করে দেখানো। এই ব্যাপারে শেরল বেনার্ডের বক্তব্য হলো, মুসলিম-সমাজে হিজাবের ব্যাপারটি এত গুরুত্বের চোখে দেখাটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। কারণ কুরআন সুস্পষ্টভাবে এই হিজাবের প্রতি সমর্থন প্রদান করে না। কুরআনে কেবল নির্দিষ্ট কিছু নারীর ক্ষেত্রে এই বিধান এসেছে। আর তারা হলেন রাসুলের স্ত্রীগণ।[১৫৩]

কুরআনে যদি কোনো আদেশ কিংবা নিষেধসম্বলিত একটি আয়াত আসে, তবে সেই আয়াতটি উক্ত আদেশ ও নিষেধকে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। অথচ পবিত্র কুরআনে হিজাবের ব্যাপারে এবং সৌন্দর্য প্রকাশ না করা প্রসঙ্গে চারটি সুস্পষ্ট আয়াত এসেছে।[১৫৪] আরবি ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্রতিটি ব্যক্তিই বুঝতে পারবে যে, এই চার আয়াতে হিজাবের ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ ও নির্দেশনা আছে। এমনকি যেই ব্যক্তি আরবি ভাষা সম্পর্কে জানে না, সে যদি কোনো প্রকার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে কেবল সত্য অনুসন্ধানের নিমিত্তে এই আয়াতগুলোর অর্থ ভালো করে পড়ে, তাহলে সে হিজাবের প্রতি কুরআনের শক্তিশালী নির্দেশকে অনুধাবন করতে পারবে। ড. ক্যাথরিন বুলক[১৫৫] একজন আমেরিকান নারী গবেষক, যিনি পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার অনুধাবন হলো, হিজাবের ব্যাপারে কুরআনের আয়াতগুলো এতই সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেক মুসলিম মুমিন নারীর জন্য হিজাব পরা আবশ্যক।[১৫৬] তিনি নিজেও হিজাব পরার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ এটি ইলাহি নির্দেশ। যা অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রায় পুরো বিশ্বেই নিত্যদিনকার ঘটনা। কোথাও হিজাবের কারণে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হচ্ছে, কোথাও হিজাবের কারণে পরীক্ষার হল থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে, আবার কোথাও হিজাবের কারণে কটু কথা বা ফিজিক্যাল আক্রমণেরও শিকার হতে হচ্ছে। এটাই বর্তমান লিবারেল ও সেকুলার সমাজের চিত্র।

১৫৩. সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩৪

১৫৪. সুরা নুর, আয়াত ৩১; সুরা আহযাব, আয়াত ৩৩, ৫৩, ৫৯; এ ছাড়াও বেশ কিছু আয়াত আছে যেগুলো থেকে হিজাবের বিধান উলামায়ে কেরাম প্রমাণ করেছেন।

১৫৫. ১৯৪৫ সালে জন্ম। অস্ট্রেলিয়ান এই নারী স্থায়ীভাবে এখন কানাডাতে বসবাস করেন। ১৯৯৪ সালে এই নারী ইসলাম গ্রহণ করেন। হিজাব নিয়ে গবেষণাকালে মুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলাম কবুল করে নেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ হলো, নাজরাতুল গারবি ইলাল হিজাব। এই গ্রন্থে তিনি হিজাব নিয়ে একাডেমিকভাবে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা পেশ করেছেন।

১৫৬. নাজরাতুল গারবি ইলাল হিজাব, পৃষ্ঠা ২১

এমনকি এই ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর জন্য তার সহকর্মী ও সমাজের কারও দিকেই ভ্রুক্ষেপ করেননি।[১৫৭]

ইসলামি ফিকহের ইতিহাসে এমন কারও বক্তব্য পাওয়া যাবে না যে, হিজাব একটি প্রথা, শরিয়াহর বিধান নয়। এটি নব্য আবিষ্কৃত মিথ্যা দাবি, যা উপনিবেশবাদী শয়তানরা মুসলিম-সমাজে ছড়ানোর চেষ্টা করেছে। এবং মুসলিমদের ভেতর থেকে তাদের কিছু বন্ধু কিংবা প্রভাবিত ব্যক্তি এই দাবিকে লুফে নিয়েছে। এর ওপর তারা নিজেদের মনগড়া অসার কিছু যুক্তির প্রলেপ দিয়েছে।

হিজাবের সাথে দীনি সম্পর্ককে ছিন্ন করার প্রচেষ্টা তাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার। কারণ মুসলিম নারীদের ভেতর এই চিন্তা ঢুকিয়ে দিতে পারলে তারা একসাথে অনেকগুলো উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারবে।

প্রথমত, তারা মুসলিম নারীদের ইসলামি শরিয়াহর বিরুদ্ধে সহজেই দাঁড় করাতে পারবে। এই ক্ষেত্রে মুসলিম নারীরা অনুধাবনও করতে পারবে না যে, তারা আসলে কোনো প্রথার বিরুদ্ধে নয়, তাদের রবের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, তারা ভালো করেই জানে যে, যারা মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়ন করতে চায়, তারা হিজাবকে শরিয়াহর আবশ্যকীয় একটি বিধান মনে করে। এখন যদি মুসলিম নারীদের মাঝে হিজাবের শরয়ি মর্যাদা নষ্ট করা যায়, তাহলে এদের ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়নের বিরুদ্ধেও দাঁড় করানো যাবে।

তৃতীয়ত, হিজাবের গুরুত্ব কমিয়ে যদি মুসলিম নারীদের বেপর্দা ও দেহের সৌন্দর্য প্রদর্শনীতে লিপ্ত করা যায়, তাহলে মুসলিম-সমাজে অশ্লীলতা, যিনা, পরকীয়া ও যৌনতাকে ব্যাপক করা যাবে। যা মুসলিম-সমাজকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর হবে। আমরা যদি বর্তমান সমাজে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে তাদের এই তিনটি এজেন্ডার বাস্তবায়ন সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাব।

হিজাবের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা অভিভাবক কি নারীকে হিজাব পরিধান করতে বাধ্য করতে পারবে? ইসলামি শরিয়াহ প্রধানত

---

১৫৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১-২২

মানুষকে অন্তরের গভীর বিশ্বাস থেকে আন্তরিকভাবে শরিয়াতের আদেশ-নিষেধসমূহ পালন করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর এই স্বেচ্ছায় আন্তরিক আনুগত্যকে বাস্তবায়নের জন্য ইসলাম মানুষের অন্তরে দীনি অনুভূতি জাগানোর চেষ্টা করে, তার মাঝে ঈমানের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করে এবং মানুষকে আখেরাতের কথা স্মরণ করতে বলে। তবে এই প্রচেষ্টা সকল মানুষকে ইসলামি শরিয়াহর আদেশ-নিষেধের ওপর উঠিয়ে আনতে যথেষ্ট নয়। কারণ তারা দীনি চেতনা, ঈমানি মূল্যবোধ ও পরকালীন চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের নয়; বরং অনেক মানুষ এমন আছে, যাদের ওপর প্রবৃত্তি, খাহেশাত ও মন্দ চিন্তার প্রাবল্য থাকে। এমন মানুষের প্রকাশ্য পাপাচার অন্যান্য মানুষের ওপরও প্রভাব ফেলে। এজন্য জরুরি হলো, শরিয়াহর নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর প্রকাশ্য বাস্তবায়ন এবং তার প্রচারণাকে পার্থিব কোনো শাস্তি আরোপের মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত করা। এতে করে সমাজ ফাসাদের হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং ব্যক্তি নিজেও পাপ থেকে দূরে সরে আসতে থাকবে। তবে হিজাব পরিত্যাগের জন্য এমন কোনো শাস্তির নির্দেশনা ইসলামি শরিয়াতে নেই, যার দরুন কোনো অঙ্গহানি হয় কিংবা শরীর প্রবলভাবে আহত হয়।[১৫৮]

মূলত হিজাবের প্রতি শেরল বেনার্ড কিংবা র‍্যান্ড কর্পোরেশনের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই জঘন্য। সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম নামক রিপোর্টে শেরল বেনার্ড হিজাবের ব্যাপারে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছে। তার কাছে হিজাব হলো, লাগামের একটি রূপ। হিজাবের মতো প্রতীকী মূল্যবোধ উগ্রবাদীদের কাছে প্রচারকেন্দ্রের মতো গুরুত্ব রাখে। কোনো বিপ্লবী আন্দোলন যেমন প্রচারকেন্দ্র দখল করার মাধ্যমে নিজেদের পরিকল্পনা প্রকাশ করে, তেমনিভাবে উগ্রবাদীরাও মুসলিম নারীদের ওপর হিজাব চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নিজেদের পদক্ষেপসমূহের জানান দেয়। ইউরোপের কিছু লিবারেলদের বক্তব্য উল্লেখ করে র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের উলঙ্গ বীভৎসতা আরও মারাত্মকভাবে প্রকাশ করেছে। ইউরোপের কিছু লিবারেলদের মতে, হিজাব যোদ্ধাদের সামরিক ইন্টেন্ট (উদ্দেশ্য) ও ইসলামি লড়াইয়ের পতাকা সদৃশ।[১৫৯]

---

১৫৮ [illegible]

ইতিপূর্বে উপনিবেশ আমলেও উপনিবেশবাদীরা হিজাবকে ইসলামি বিশ্বের প্রতীক ও নিদর্শন হিসেবে দেখেছে। এরপর ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিজাব তাদের নিদর্শন হয়ে গেছে, যারা কুরআন-সুন্নাহকে একনিষ্ঠভাবে পালন করতে চায়। র‍্যান্ডের ভাষায় যাদের ফান্ডামেন্ডালিস্ট বা উগ্রবাদী বলা হয়।[১৬০] বর্তমানে হিজাবকে এমনভাবে ক্রিমিনালাইজ করা হয়েছে যে, এটাকে একটি অপরাধ কিংবা আতঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। যার দরুন অনেক প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে হিজাব পরিধানকে অফিসিয়ালভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রেখেছে। অবশ্য তাদের এই আচরণ কেবল হিজাবের সাথেই নয়, বলা যায় পুরো ইসলামি পোশাকপরিচ্ছদ ও জীবনব্যবস্থাকে অপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

শেরল বেনার্ড সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলামের পরিশিষ্টে বস্তুনিষ্ঠতার বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে তার অন্তরের সকল ক্ষোভ-বিদ্বেষ হিজাবের ওপর ঝেড়েছে। এই ক্ষেত্রে সে তার পূর্বসূরিদের বিভিন্ন অসার ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্যকে খুঁজে খুঁজে তার দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে একত্রিত করেছে। সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলামে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে (তাদের ভাষায়) ফান্ডামেন্টালিস্টদের নিয়ে। তারা হিজাবকে উগ্রবাদের সাথে সম্পৃক্ত করে অত্যন্ত নিকৃষ্টভাবে মুসলিম নারীদের উপস্থাপন করেছে। তাদের ভাষায়, নারীরা হিজাব পরে ব্রেইনওয়াশ হওয়ার মাধ্যমে অথবা চাপের কারণে, কিংবা অন্য কোনো সহিংসতা থেকে বাঁচতে। কিন্তু মুসলিম নারীরা যে, আল্লাহর আনুগত্যের কাছে নতি স্বীকার করে, তাঁর নির্দেশকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে, একমাত্র ইবাদাত হিসেবে হিজাব পরিধান করতে পারে—তারা এটা কল্পনাও করতে পারে না।

উপনিবেশের সময় উপনিবেশবাদীরা মুসলিম নারীদের হিজাব খোলার জন্য সমস্ত আয়োজন করে গেছে। উপনিবেশের ছত্রছায়ায় প্রাচ্যবাদীরা হিজাবের এমন ব্যাখ্যা প্রচার করার প্রয়াস চালিয়েছে, যা একাডেমিক মানদণ্ডে কখনোই উত্তীর্ণ হতে পারে না। তাদের মতে, মুসলিম নারীরা জোরজবরদস্তির কারণে হিজাব পরিধান করে। হিজাব নারীদের ওপর শোষণের প্রতীক। মূলত সেই উপনিবেশবাদী ও প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিতেই পশ্চিমা বিশ্ব আজও হিজাবকে বিবেচনা করে থাকে।

---

১৬০ . নাজরাতুল গারবি ইলাল হিজাব, পৃষ্ঠা ১৯৫

হিজাবের বিস্তার লাভ ও র‍্যান্ডের পর্যবেক্ষণ

র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের এক রিপোর্টে হিজাব বিস্তার লাভের প্রসঙ্গে বলে, মুসলিম তরুণীদের মাঝে হিজাব ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছে। তুরস্ক, মরক্কো, আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়া সব জায়গাতেই মুসলিম তরুণীদের মাঝে হিজাবের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। তাদের মতে, হিজাবের এই বিস্তার লাভ ইসলামি আন্দোলনের অগ্রগতির নিদর্শন, যার সূচনা হয়েছিল ১৯৭০ সালে।[১৬১]

পাশাপাশি র‍্যান্ড কর্পোরেশন এর কারণ অনুসন্ধানেরও চেষ্টা করে। মুসলিম নারীদের মাঝে হিজাবের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়া দীনদারিতা না-কি কেবল সামাজিক ট্রেন্ড? ইরানি নারীদের ক্ষেত্রে তারা দ্বিতীয় কারণকে প্রাধান্য দিয়েছে।[১৬২]

একই সাথে তারা মুসলিম নারীদের হিজাব ছাড়ার বিষয়টিকেও পর্যবেক্ষণে রেখেছে। চাই সেই হিজাব ছাড়াটা আংশিকভাবে হোক অথবা বাহ্যিকভাবে হোক; কিংবা সৌন্দর্য প্রকাশ করে পরিপূর্ণরূপেই হোক। এবং তারা এমন কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির দিকেও ইঙ্গিত করেছে, যারা মুসলিম নারীদের হিজাব ছাড়ানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালন করছে।[১৬৩]

র‍্যান্ড কর্পোরেশন আরেক রিপোর্টে তুরস্কে হিজাবের প্রসঙ্গ নিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ পেশ করে। সেখানে তারা হিজাবের প্রতি তুরস্কসমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কী, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে হিজাবের নিষিদ্ধতা ওঠানোর ক্ষেত্রে জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির[১৬৪] অগ্রগতিমূলক প্রচেষ্টা কী, তা নিয়ে আলোচনা করে।[১৬৫] সেই রিপোর্টে একটি বিষয় ফুটে উঠেছে যে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির যেই আগ্রহ, সেটাকে তারা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে এবং জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির বিভিন্ন

---

১৬১. the muslim world after 9/11- 40, 162, 191

১৬২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৯

১৬৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৩, ১৫৯, ২৩১

১৬৪. এটি তুরস্কের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল, রেজেপ তায়্যিপ এরদোয়ান ২০০১ সালে দলটিকে প্রতিষ্ঠা করে এবং তার নেতৃত্বে দলটি ২০০২, ২০০৭ ও ২০১১ সালের সংসদ নির্বাচনে জয় লাভ করে। ২০১৪ সালে এরদোয়ান রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে দলের নেতৃত্ব থেকে সরে যান। ২০১৭ সালে সংবিধানের গণভোটের পর তিনি আবার দলের নেতৃত্বে ফিরে আসেন।

১৬৫. The rise of political islam in turkey, p 60-63

ইসলামি সংশোধনমূলক কাজের ওপর প্রেশার ক্রিয়েট করছে। ২০০৪ সালে ইউরোপীয় আদালত তুরস্কে হিজাব নিষিদ্ধ থাকার সমর্থনে হিউম্যান রাইটস চার্টার প্রকাশ করে।[১৬৬]

আমেরিকান ও ইউরোপীয় কিছু সংবাদমাধ্যমে হিজাব পরিহিত নারীর ছবি প্রচার এবং পশ্চিমা বিশ্বে এর সমালোচনা

শেরল বেনার্ড ইউরোপীয় মুসলিমদের মাঝে জনপ্রিয়তা পাওয়া কিছু বইয়ের সমালোচনা করেছে। যেই বইগুলো ইউরোপীয় মুসলিম নারীদের গুণাবলি প্রসঙ্গে বলেছে যে, তারা অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির, মাথা ঢেকে রাখে, কেউ কেউ লম্বা নিকাবও পরে। এবং বইগুলো এই বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি নারীদের উদ্বুদ্ধ করেছে। বেনার্ড এই গুণগুলোর নোংরা সমালোচনা করতে গিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, মিলিয়ন মিলিয়ন সেসব মুসলিম নারীদের ব্যাপারে তাহলে কী বলা হবে, যারা এসবের সরাসরি বিরোধিতা করে?

এর পাশাপাশি বেনার্ড আমেরিকার কিছু সংবাদমাধ্যম ও রাজনীতিবিদদেরও সমালোচনা করেছে। শুধু এই কারণে যে, তারা হিজাব পরিহিত নারীর ছবি প্রকাশ করেছে, অথবা হিজাব পরিহিত নারীর সাথে তাদের ছবি প্রকাশ পেয়েছে। আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের অফিসিয়াল সাইটের বিশ্ব তথ্যকোষে আমেরিকান মুসলিমদের জীবনাচার তুলে ধরতে গিয়ে হিজাব পরিহিত ও মুখ ঢাকা নিকাব পরিহিত ৩২ জন মুসলিম নারীর ছবি প্রকাশ করেছে। আর মাত্র ১৩ জন বেপর্দা ও সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী নারীর ছবি প্রকাশ করেছে। এজন্য বেনার্ড এই সাইটেরও সমালোচনা করেছে। বেনার্ডের মতে, হিজাব পরিহিত নারীদের ছবি আমেরিকান মুসলিম নারীদের মূল অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে না; বরং হিজাব পরিহিত নারীরা আমেরিকান মুসলিম কমিউনিটির পার্শ্টীকার অবস্থানে আছে।[১৬৭] অর্থাৎ হিজাব পরিহিত নারীরা আমেরিকায় এতই অল্প যে, তাদের গণনায় ধরা যায় না।[১৬৮]

---

১৬৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৭

১৬৭. সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম, ৫৪-৫৬ পৃষ্ঠা; পরিশিষ্ট-২, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৯

১৬৮. একটা বিষয় পরিষ্কার করা জরুরি। সেটা হলো, মূলত ইসলামে হিজাব কিংবা পর্দার বিধান মাথায় এক টুকরো কাপড় ফেলে রাখার নাম নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গিকে ধারণ করে।

বেনার্ড তার রিপোর্টের শেষ পরিশিষ্টে আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এক পার্লামেন্ট সদস্যের পক্ষ থেকে ২০০২ সালে প্রেরিত একটি চিঠিকেও যুক্ত করে দিয়েছে। সেই চিঠিতে উক্ত সদস্য কিছু বিষয়ের সমালোচনা করেছে। এর মধ্যে কিছুক্ষণ আগে আমেরিকান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইটে বেপর্দার চেয়ে হিজাব ও নিকাব পরিহিত নারীদের ছবি প্রকাশের ঘটনা অন্যতম। এই ঘটনার সমালোচনা করতে গিয়ে উক্ত সদস্য বলে, আমেরিকান মুসলিমদের জীবনাচারের ভিন্নতা তুলে ধরতে গিয়ে এই ধরনের প্রচেষ্টা মূলত কট্টর মুসলিমদের সীমিত পর্যায়ে হলেও হাইলাইট করেছে। এবং আমেরিকাকে এমনভাবে চিত্রায়িত করেছে, যেন এটাই সেই ভূমি যেখানে প্রায় সকল মুসলিম নারী হিজাব পরে। এটি একদিকে যেমন বাস্তবতাবিরোধী, অন্যদিকে রাজনৈতিকভাবেও ফলপ্রসূ নয়।

জাতিসংঘ কি আফগানে বোরকা ও হিজাব ত্যাগকারী নারীদের কাছে এই বার্তাই পাঠাতে চায়? তারা কি পোশাকের স্বাধীনতার জন্য (অর্থাৎ বেপর্দা পোশাকের জন্য) লড়াইকারী ইরানি নারীদের এই ম্যাসেজই দিতে চায়? তারা কি তুর্কি নারীদের কাছে এই বার্তাই পৌঁছাতে চায়? যারা তুরস্কে ইসলামি রাষ্ট্রের আদলে একটি গণতান্ত্রিক সেকুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়? আমি এটা কখনোই বিশ্বাস করি না।[১৬৯]

চিঠিতে ওই পার্লামেন্ট সদস্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশে আরও বলে, এই ব্যাপারগুলো উগ্রবাদ মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু এগুলো মোটেও তুচ্ছ কোনো বিষয় নয়। চিন্তাদর্শন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার মাধ্যমে আমরা

বর্তমানে মুসলিম নারীদের জনপ্রিয় একটি মনোভাব হলো, হিজাব পরে সব করা যায়। এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। এজন্য দেখা যায়, হিজাব পরিধান করে কোন নারী মডেল হলে কিংবা শরিয়াহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কোনো সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ পদ পেলে আমরা এই কারণে আনন্দ প্রকাশ করছি যে, মেয়েটি হিজাব পড়েছে। হিজাব নারীদের উন্নতি-অগ্রগতির পথে বাধা কি-না এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে আমাদের আগে উন্নতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করে নিতে হবে। যদি আমরা উন্নতি-অগ্রগতিকে পশ্চিমা কনসেপ্টে গ্রহণ করি, তবে অবশ্যই শরয়ি হিজাব এর পথে পরিপূর্ণ বাধা সৃষ্টিকারী। আর যদি আমরা উন্নতিকে তার শরয়ি কনসেপ্টে গ্রহণ করি, তবে কখনোই তা নারীর উন্নতি-অগ্রগতির জন্য বাধা নয়; বরং পরিপূর্ণ সহায়ক। এই বিষয়টি মাথায় রাখলে আমাদের জন্য সমাজে হিজাবের বাস্তবতা ও করণীয় সম্পর্কে অনেক বিষয়ই পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

১৬৯. সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম, পরিশিষ্ট-৩, পৃষ্ঠা ৭৫

দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে বিজয়লাভ করতে পারি। মস্তিষ্ক ও মননের ওপর নিয়ন্ত্রণ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রধান উপাদান।[১৭০]

এভাবেই হিজাব র‍্যান্ড কর্পোরেশনের গবেষক ও আমেরিকান পলিসিতে প্রভাব বিস্তারকারী লোকদের কাছে ওয়ার অন টেররের একটি শব্দে পরিণত হয়েছে। যার দরুন মিডিয়াগুলোও হিজাব কিংবা নিকাব পরিহিত নারীদের ইতিবাচকতার পরিবর্তে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করতে বেশি আগ্রহী।[১৭১] অধিকাংশ পশ্চিমারাই হিজাবকে পশ্চিমা স্বার্থের দৃষ্টিতে দেখে। ন্যায়, সত্য, বাস্তবতা কিংবা বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ তাদের নেই। এজন্য জার্মানিতে যখন একজন মুসলিম বোনকে অন্য কোনো কারণে নয়, কেবল হিজাব পরার কারণে শহিদ করা হয়েছিল, তখন ইউরোপের মিডিয়াগুলোতে ওই বোনকে নিয়ে সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু হত্যাকারীকে সন্ত্রাসী কিংবা উগ্রবাদী এই ধরনের কোনো ট্যাগ পেতে হয়নি।[১৭২]

যখন সিঙ্গাপুর, ফ্রান্স, জার্মানিসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা কর্মস্থলে হিজাবকে নিষিদ্ধ করে, যখন হিজাব পরিহিত মুসলিম নারীরা ইউরোপের পাব্লিক প্লেসে উত্যক্তের শিকার হয়, তখন র‍্যান্ডের দৃষ্টিতে অভিযুক্তরা অপরাধী নন; বরং হিজাব পরার অধিকার নিয়ে যারা দাবি তোলে, তারাই উগ্রবাদী![১৭৩]

হিজাবের প্রতি র‍্যান্ডের দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা ও মুসলিমদের দায়িত্ব

ওপরের আলোচনা থেকে একটা বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায়, নারী-স্বাধীনতা একটি পশ্চিমা রাজনৈতিক পরিভাষা। যাকে পশ্চিমাদের স্বার্থ অনুযায়ী ব্যবহার ও ব্যাখ্যা

---

১৭০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫

১৭১. কোনো হিজাব পরিহিত নারীকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করলেও সেটার পিছনে থাকে ভিন্ন উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সেই হিজাব পরিহিত নারীকে তারা এই কারণেই ইতিবাচক হিসেবে উপস্থাপন করছে যে, সে হিজাব পরিধান করেও পশ্চিমা মানদণ্ড অনুযায়ী উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের (নারীর ক্ষমতায়নের) কাজ করে যাচ্ছে, কিংবা পশ্চিমা স্বার্থ রক্ষাকারী কোন বিষয়ে সে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে।

১৭২. https://bit.ly/3ottusH

১৭৩. the muslim word after 9/11, p 391

করা হয়। তারা যেটাকে স্বাধীনতা মনে করবে সেটাই স্বাধীনতা, যদিও সেটা নারীর ইচ্ছা ও আগ্রহের বিরুদ্ধে যায়। আবার তারা যেটাকে স্বাধীনতার বিরোধী মনে করবে, সেটাই স্বাধীনতার পরিপন্থি হিসেবে বিবেচিত হবে। চাই নারীরা সেটা যত আগ্রহ ও সন্তুষ্টির সাথে কামনা করুক না কেন।

মূলত মুসলিম নারী সম্পর্কে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের দৃষ্টিভঙ্গির নমুনা নতুন কোনো বিষয় নয়। এমন না যে, তারাই প্রথম মুসলিম নারীদের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে। উপনিবেশবাদীরা মুসলিম দেশগুলোতে দখলদারিত্ব ও লুটপাট চালানোর সময় মুসলিমদের ওপর তাদের উপনিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেওয়ার সিলসিলা তৈরি করে গেছে। যা বর্তমানে বিভিন্ন নামে ও স্লোগানে চলমান আছে।

মিশরে ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলে ১৮৯৪ সালে সর্বপ্রথম একটি বই প্রকাশিত হয়। যার নাম ছিল আল মারআতু ফিশ শারকি তথা প্রাচ্যের নারী। বইটির লেখকের নাম মার্ক ফাহমি। লেখক বইটিতে ইসলামি শরিয়াহর ওপর নোংরা আক্রমণ চালায় এবং নারীদের ইসলামি শরিয়াহ থেকে মুক্ত হবার আহবান জানায়। এমনিভাবে উপনিবেশ আমলের কাসিম আমিন, হুদা শারাওয়িরাও এই একই ভূমিকা পালন করে। উপনিবেশ আমলের তৈরি করা সেই সিলসিলা আধুনিক বিভিন্ন কাঠামোতে আজও কাজ করে যাচ্ছে। বইয়ের শুরুতে আমরা বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরে ধরেছি।

ইসলামি শরিয়াহ গাইরে মাহরাম নারী-পুরুষের মাঝে নৈতিক কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। যা মূলত নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মানই রক্ষা করে। পাশাপাশি সমাজকে নৈতিক অধঃপতন ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে। স্বভাবজাত হায়াকে বজায় রাখা, হিজাবের পাবন্দ করা, দৃষ্টি অবনত রাখা, সাধারণত ঘরেই অবস্থান করা, ফ্রি-মিক্সিং-এ না জড়ানো, নিম্নস্বরে কথা বলা, মাহরাম পুরুষ ছাড়া সফর না করা, অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়া, হারাম রিলেশনে না জড়ানো—এই সবগুলো ব্যাপার নৈতিকতার রক্ষাকবচ। পশ্চিমারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে এই সুরক্ষা কবচগুলো ভেঙে দিতে। যেন তারা মুসলিমদের ওপর সর্বদা নিজেদের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে।

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের রিপোর্ট তৈরিকারীদের মধ্যে অন্যতম একজন গবেষক হলো

শেরল বেনার্ড। যে একজন ইহুদি নারী। মুসলিম নারীর পর্দার বিরুদ্ধে ইহুদিদের শত্রুতা অনেক পুরনো। এই ইহুদিদের একজন বনু কাইনুকার বাজারে আমাদের এক বোনকে বেপর্দা করে সম্ভ্রমহানি করেছিল। এই সম্ভ্রমহানি আঘাত হেনেছিল একজন সাহাবির আত্মমর্যাদায়। অভিশপ্ত সেই ইহুদিকে রাসুলের সাহাবি সেখানেই হত্যা করে ছিলেন এবং তিনি নিজেও ইহুদিদের হাতে শাহাদাতবরণ করেছিলেন।[১৭৪]

পর্দা ইসলামি শরিয়াহর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কিতাবে এর প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মোবারক হাদিসে এর প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। রাসুলের যুগ থেকেই মুসলিম নারীরা পর্দার বিধান পালন করে আসছিলেন আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যস্বরূপ। বর্তমান সময়ে মুসলিম নারীদের জন্য জরুরি হলো, বিচ্ছিন্ন ও উদ্দেশ্যমূলক মতের ব্যাপারে সচেতন থাকা। পশ্চিমাদের কথায় কিংবা তাদের অনুসারীদের বক্তব্যে নিজের দীনের ব্যাপারে প্রতারিত না হওয়া, হীনম্মন্যতায় না ভোগা; বরং নিজের ভেতর এবং আশপাশের মুসলিম বোনদের ভেতর পর্দার গুরুত্ব রোপন করা। এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, হিজাব মহান রবের দেওয়া এক আবশ্যকীয় বিধান, যার পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণ রয়েছে।

হিজাবের বন্ধন ও চেতনা থেকে ছিন্ন হওয়া অনেক বড় একটি গুনাহ। যা একই সাথে আরও অনেকগুলো বড় বড় পাপের দিকে নিয়ে যায়। যেমন শরীরের কোনো অঙ্গকে প্রকাশ করা, দেহে সাজ-সজ্জার মাধ্যমে কৃত্রিম সৌন্দর্য প্রকাশ করা, অন্যকে ফিতনায় ফেলা। নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন ও অবাধ চলাফেরা সামাজিক অধঃপতনকে তরান্বিত করে এবং আল্লাহর শাস্তিকে দুনিয়ায় নামিয়ে আনে। আর পরকালে এই ধরনের নারীরা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।[১৭৫]

---

১৭৪. সিরাতে ইবনে হিশাম, ৩/৪৮ পৃষ্ঠা, মুস্তাফা আস সাকা ও আব্দুল হাফিজ শিবলি এর তাহকিককৃত নুসখা।

১৭৫. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দুই শ্রেণির লোক জাহান্নামি, যাদের আমি আমার যুগে দেখে যাইনি। প্রথম শ্রেণি : তারা এমন এক সম্প্রদায়, তাদের সাথে থাকবে গরুর লেজের মতো একধরনের লাঠি, যা দিয়ে তারা মানুষকে পিটাবে। দ্বিতীয় শ্রেণি হলো, কাপড় পরিহিতা নারী, অথচ নগ্ন। তারা পুরুষদের আকৃষ্টকারী এবং নিজেরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট। তাদের মাথা হবে উটের কুঁজের মতো বাঁকা। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও তারা পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে। —সহিহ মুসলিম, হাদিস ৫৫৮৩

হিজাব কেবল কোনো চয়েজের বিষয় নয়, এটি মহান আল্লাহর তাআলার দেওয়া আবশ্যকীয় বিধান। হিজাব কোনো প্রতীকী বিষয়ও নয়, এটি মহান আল্লাহর প্রতি আমাদের নিঃশর্ত আনুগত্য ও দাসত্বের নিদর্শন। হিজাব আমাদের আকিদা ও ইবাদাহ। হিজাব যখন মুসলিম নারীদের আকিদা, তখন কেউ তাদের এই আকিদার বন্ধন থেকে ছিন্ন করতে পারে না। হিজাব যদি মুসলিম নারীর জন্য মহান রবের আনুগত্য হয়, তাহলে কেউ তাকে আনুগত্যের রশ্মির ব্যাপারে প্রতারিত করতে পারে না।

জন্মনিয়ন্ত্রণ

জন্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ হলো, গর্ভে ধারণ করা সন্তানের দুনিয়ায় আগমনকে বাধাগ্রস্ত করা কিংবা বিলম্বিত করা।[১৭৬]

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের রিপোর্টে জন্মনিয়ন্ত্রণের মর্ম হলো, গড়ে প্রত্যেক পরিবারের দুই সন্তানের অধিক সন্তান না থাকা।[১৭৭]

যারা মানব সন্তানকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা করে, মহান আল্লাহ তাআলা তাদের নিন্দা করেছেন।[১৭৮] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বংশবৃদ্ধির জন্য বিয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা অধিক প্রেমময়ী ও অধিক সন্তানদানে সক্ষম মেয়েকে বিয়ে করো। কারণ আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের অধিকসংখ্যক উম্মত নিয়ে গর্ব করব।[১৭৯]

---

১৭৬. তানজিমুন নাসাল ওয়া মাওকিফুশ শা রিয়াতিল ইসলামিয়্যাতি মিনহা, পৃষ্ঠা ২৮৮

১৭৭. Pakistan : can the united states secure an insecure state? rand 2010, p 129

১৭৮. এবং মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথা তোমাকে মুগ্ধ করে। আর তার অন্তরে যা আছে সে ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষীও বানায়, অথচ সে (তোমার) শত্রুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কট্টর। সে যখন উঠে চলে যায়, তখন জমিনে তার দৌড়-ঝাপ হয় এই উদ্দেশ্যে যে, সে তাতে অশান্তি ছড়াবে এবং ফসল ও (জীব-জন্তুর) বংশ নিপাত করবে, অথচ আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টি পছন্দ করেন না। যখন তাকে বলা হয় আল্লাহকে ভয় করো, তখন আত্মাভিমান তাকে আরও বেশি গুনাহে প্ররোচিত করে। সুতরাং এমন ব্যক্তির জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট হবে এবং তা অতি মন্দ বিছানা। —সুরা বাকারা, আয়াত ২০৪-২০৬

১৭৯. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ২০৫০

সুতরাং অধিক সন্তানগ্রহণ সত্তাগতভাবে একটি কাম্য বিষয়। অধিক সন্তানলাভ ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ের অন্যতম একটি মহান উদ্দেশ্য। আবার এটি মানব ফিতরাতেরও চাহিদা। মানব-সম্পদ যেকোনো জাতির জন্য সবচেয়ে দামি সম্পদ। সংগ্রাম ও লড়াইয়ে এই সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। পশ্চিমা অনেক দেশ আজ মানব-সম্পদের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। কারণ মানব-সম্পদ একটি সভ্যতা গঠনের জন্য প্রধান ভিত্তি। এজন্য এই দেশগুলো তাদের মানব-সম্পদ বৃদ্ধি ও উন্নত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি সন্তান জন্ম দেওয়ার ওপর তারা জন্মদাতা মায়ের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কারেরও ঘোষণা দিয়েছে এবং তিনের অধিক সন্তানদানকারী মায়েদের জন্য পুরস্কারের পরিমাণ বেশি ধার্য করেছে।[১৮০]

জন্মনিয়ন্ত্রণের কারণে কোনো জাতি ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকলে তারা একসময় অস্তিত্ব সংকটে ভোগে। উদাহরণস্বরূপ যখন সেই জাতির মাঝে মহামারি ছড়িয়ে পড়ে কিংবা অন্য কোনো জাতির সাথে তাদের যুদ্ধ লেগে যায়, তখন তারা আকস্মিকভাবেই পুরুষ ও মানব-সংকটে পতিত হবে।

র‍্যান্ড কর্পোরেশন ঘনবসতি-সম্পন্ন মুসলিম দেশসমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়েও তাদের উপনিবেশবাদী গবেষণা পেশ করেছে। যেমন : মিশর, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে তাদের পৃথক পৃথক গবেষণা আছে। নিম্নে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে সেই গবেষণাগুলোর ভাষ্য দেখে নিতে পারি।

১. মিশর

২০০১ সালে র‍্যান্ড কর্পোরেশন থেকে আরবি ভাষায় মিশরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। যার শিরোনাম ছিল 'আন নুমুউস সুক্কানিয়্যু ফি মিশর : সিয়াসাতুন তাহিদ্দু মুসতামিররাতান'। সেই রিপোর্টটিতে তারা বিগত অর্ধ শতাব্দীতে মিশরে জন্মদানক্ষমতার হার নিয়ে একটি পর্যবেক্ষণ পেশ করে। দেখা যায় ১৯৯৮ সালে এসে মোট হার নারীপ্রতি ছয়-সাতজন সন্তান থেকে তিন-চারজনে নেমে এসেছে। আশঙ্কা করা হয় ২০২০ সালের শুরুতে এই হার নারীপ্রতি দুই সন্তানে নেমে আসবে।[১৮১]

---

১৮০. নয়া দিগন্ত, ০৬ এপ্রিল ২০২১

১৮১. আন নুমুউস সুক্কানিয়্যু ফি মিশর, পৃষ্ঠা ১-২
মিশরের বর্তমান বাচ্চা জন্মদানের হার নারী প্রতি ৩.২১১ একজন শিশু।

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের দৃষ্টিতে মিশরে জন্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তোলার অন্যতম কারণ হলো, বাচ্চা জন্মদানে ঊর্ধ্বগতি দেশটির ওপর বিশাল বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং তা অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাধা হয়ে দেখা দেবে। তা ছাড়া এটা নারী ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যজনিত আশঙ্কা বাড়িয়ে দেবে। শিক্ষার সুযোগ, খাদ্যের জোগান ও কর্মের ব্যবস্থার ওপরও জন্মহার প্রভাব ফেলবে। তবে যদি জন্মহারকে নিম্নমুখী করা যায়, তাহলে এই আশঙ্কাগুলো কমে যাবে। পাশাপাশি মাথাপিছু আয়ও বেড়ে যাবে।[১৮২]

রিপোর্টটিতে তারা উল্লেখ করে যে, মিশরে জন্মনিয়ন্ত্রণ সফল হওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যম ও ব্যবস্থাগুলো ব্যাপক ও সহজলভ্য হয়ে ওঠা। ১৯৭৫ সালে আমেরিকান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলো বিস্তার করার দায়িত্ব নেয়। পাশাপাশি এজেন্সিটি জন্মনিয়ন্ত্রের গুরুত্ব নিয়ে বিভিন্ন রিসার্চ ও প্রবন্ধ প্রকাশেরও দায়িত্ব নেয়, যা জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রজেক্টে মৌলিক ভূমিকা রাখে। র‍্যান্ড কর্পোরেশন উক্ত রিপোর্টে পরামর্শ দিয়ে বলে যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলোর ব্যবহারকে আরও ব্যাপক করে তুলতে হবে।[১৮৩]

লক্ষণীয় বিষয় হলো, র‍্যান্ড কর্পোরেশন উক্ত রিসার্চ প্রস্তুতের জন্য মিশরি নাগরিক মিন্নি খলিফাকেও তাদের দুইজন গবেষকের সাথে অংশগ্রহণ করিয়েছে। এর মাধ্যমে তারা মূলত সরাসরি মাঠপর্যায়ে তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অনুমোদন নিয়ে নিয়েছে।

২. পাকিস্তান

১৯৯০ সালে পাকিস্তান সরকার একটি প্রজেক্ট হাতে নেয়। সেই প্রজেক্টে পাকিস্তান সরকার কিছু নারী শিক্ষিকার সাথে বসে। তাদের জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন মাধ্যম সাথে নিয়ে গ্রামীণ নারীদের বাড়িতে পরিদর্শক হিসেবে যাওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। র‍্যান্ড কর্পোরেশন পাকিস্তানকে নিয়ে বানানো রিপোর্টে এই কর্মসূচীকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ফোকাস করেছে এবং এর প্রশংসা করেছে।

---

১৮২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩, ৫, ৭

১৮৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯, ১২

রিপোর্টটিতে তারা ইঙ্গিত দিয়েছে যে, পাকিস্তান সরকারের এই প্রজেক্ট দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলোর ব্যবহার বৃদ্ধিতে কিছুটা সফল হয়েছে।[১৮৪]

রিপোর্টটি পাকিস্তানে পরিবার পরিকল্পনা নামক প্রজেক্টেরও প্রশংসা করেছে। যদিও জিয়াউল হক[১৮৫] রহিমাহুল্লাহর সরকারের আমলে এই প্রজেক্ট অনেকটা কোণঠাসা ছিল। তথাপি এই প্রজেক্ট তার নতুন পরিকল্পনায় জন্মদানের হারকে সীমাবদ্ধ করা এবং ২০২০ সালের ভেতর রিপ্লেসমেন্ট লেভেল তথা প্রত্যেক বাবা-মা প্রতি দুইজন সন্তানের সীমায় জন্মদানের হার নামিয়ে আনার টার্গেট গ্রহণ করে।[১৮৬] র‍্যান্ড কর্পোরেশন রিপোর্টটিতে দাবি করে, বিগত বছরগুলোর তুলনায় জন্মদানের হার কমে যাওয়ার কারণে পাকিস্তানের প্রত্যেক সদস্যের মাথাপিছু আয়, শিক্ষা ও নগরসুবিধা বেড়ে গেছে।[১৮৭]

পাশাপাশি তারা পাকিস্তানের জনসম্পদকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসচেতন খাতে অর্থ ব্যয়ের পরামর্শ প্রদান করে।[১৮৮] আর স্বাস্থ্য সচেতনতার ভেতর জন্মনিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ও বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত।

রিপোর্টটিতে র‍্যান্ড কর্পোরেশন পাকিস্তানে আমেরিকান প্রজেক্টের সহযোগী রাষ্ট্রের কার্যক্রম নিয়েও আলোকপাত করে। এর মধ্যে ২০০৩ সালে ব্রিটেন সামাজিকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলোর ব্যবহারকে ব্যাপক করতে প্রায় ১২ মিলিয়ন ডলার প্রদান করে।[১৮৯]

র‍্যান্ড মনে করে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে কমিয়ে আনা ভবিষ্যতে সরকারের

---

১৮৪. Pakistan : can the united states secure an insecure state? P 131

১৮৫. ১৯২৪-১৯৮৮। সাতজন সিনিয়র সেনা সদস্যকে ডিঙিয়ে জিয়াউল হক সাহেবকে সেনাপ্রধান বানান তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান জুলফিকার আলি ভুট্টো। পরবর্তী সময়ে তার বিরুদ্ধেই সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন জিয়াউল হক সাহেব। ক্ষমতাগ্রহণের আড়াই বছরের মাথায় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তার মৃত্যুদণ্ডও দেন। ১৭ আগস্ট ১৯৮৮ সালে সামরিক মহড়া দেখে ফেরার পথে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে তিনি নিহত হন। বলা হয়, বিমানটিকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিধ্বস্ত করে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককে হত্যা করা হয়।

১৮৬. বর্তমানে পাকিস্তানে ফার্টিলিটি রেট বা বাচ্চা জন্মদানের হার হচ্ছে, প্রতি নারীপ্রতি ৩.৩৬৩ জন শিশু

১৮৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৯-১৩০

১৮৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৮

১৮৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৫

জন্য অনেক সহায়ক হবে এবং জনসেবামূলক কাজের চাপকে হালকা করবে। পক্ষান্তরে এই হার যদি দ্রুত বর্ধমান হয়, তাহলে এটা ভবিষ্যতে সরকারের জন্য বিভিন্ন প্রকার সমস্যা ও হুমকি তৈরি করবে।[১৯০]

উক্ত রিপোর্টে র‍্যান্ড কর্পোরেশন আরেকটি সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে যে, পাকিস্তানে নারীদের অধিক সময়ের জন্য পড়ার সুযোগ পাওয়া জন্মদানের হারকে হ্রাস করতে ভূমিকা রাখছে। এজন্য তারা মনে করে জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়া পাকিস্তান সরকারের জন্য কল্যাণকর হবে এবং তা ভবিষ্যতের অনেক চাপকে হালকা করবে।[১৯১]

রিপোর্টটিতে র‍্যান্ড তরুণীদের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নারীশিক্ষাকে জন্মনিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত করে দেখিয়েছে এবং নারীশিক্ষাকে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যম ব্যবহারে অধিক সম্ভাবনা তৈরিকারী হিসেবে উপস্থাপন করেছে। তাদের বক্তব্য হলো, নারীদের জন্য শিক্ষার অধিক সম্ভাবনা তৈরি হওয়া একই সাথে তাদের জন্মদানের হারকে নিম্নমুখী করবে এবং তার চেয়েও বেশি তাদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনার সেবা গ্রহণের মানসিকতা তৈরি করবে।[১৯২]

র‍্যান্ডের এই বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পশ্চিমারা যেই নারীশিক্ষার দাবি তোলে, তার উদ্দেশ্য কখনো নারীদের তাদের প্রকৃত অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া নয়; বরং তারা যেই শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার দাবি তোলে, তা প্রকৃতপক্ষে তাদের উপনিবেশবাদী স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করে। এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তারা তাদের উপনিবেশবাদী স্বার্থে নিবেদিত সেবক তৈরি করে থাকে। এজন্যই তাদের কাছে নারীর শিক্ষার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সে কোন পরিবেশে শিক্ষা লাভ করছে এবং সে তার শিক্ষা দিয়ে তাদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কতটুকু সেবা করছে। সে শিক্ষা লাভের পর পশ্চিমা সংস্কৃতি ও স্বার্থ বাস্তবায়নে কতটুকু ভূমিকা পালন করছে।

কোনো নারী যদি সাধারণ জ্ঞানলাভের পর তার পরিবার গঠন ও প্রজন্ম গড়ার শিক্ষা লাভ করে, তাহলে সেই নারী পশ্চিমাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হিসেবে বিবেচিত হবে না। কোনো নারী যদি শিক্ষালাভের পর কর্মক্ষেত্রের অস্বস্তিকর

---

১৯০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯

১৯১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯

১৯২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯

পরিবেশ থেকে দূরে থেকে তার পরিবারে নিজ শিক্ষার আলো ছড়ায়, তাহলে সেই নারীও পশ্চিমাদের কাছে শিক্ষিত হিসেবে পরিগণিত হবে না। কারণ এই শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের ঘর থেকে বের করে পরিবারকে বিরান করার যেই পশ্চিমা স্বার্থ রয়েছে, তাতে ওই নারী কাজে লাগছে না। তাদের কাছে একজন নারী তখনই শিক্ষিত হবে, যখন সে পশ্চিমা শিক্ষা গ্রহণ, পশ্চিমা আদর্শ গ্রহণ ও পশ্চিমা স্বার্থ বাস্তবায়ন করবে।

৩. মালয়েশিয়া

২০০৩ সালে র‍্যান্ড কর্পোরেশনের তিনজন গবেষক মিলে মালয়েশিয়াতে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে।[১৯৩] উক্ত রিপোর্টে তারা মালয়েশিয়ায় ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেছে। পাশাপাশি তারা এটাও জানার চেষ্টা করেছে যে, কী কী কারণে মালয়েশিয়ার দম্পতিরা জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রজেক্টে অবহেলা প্রদর্শন করছে। কোন কোন বিষয় তাদের মাঝে প্রভাব ফেলছে। শিক্ষা, শিশুদের মৃত্যু, মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট যা বৃহৎ পরিবার গঠনে উৎসাহিত করে, নাকি অন্য কিছু।

জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে র‍্যান্ডের দাবি ও তার পর্যালোচনা

পূর্বের আলোচনা থেকে আমাদের সামনে এটা স্পষ্ট যে, র‍্যান্ড কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য হলো, জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো সহজলভ্য করে ছড়িয়ে দেওয়া, এগুলোর ব্যবহার বৃদ্ধি এবং প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য গড়ে দুই সন্তান পর্যন্ত জন্মহার নামিয়ে আনা।[১৯৪] পাশাপাশি তাদের এই জন্মনিয়ন্ত্রণের পথে বাধাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করা। আর জন্মনিয়ন্ত্রণ এজেন্ডায় সফল হওয়ার ক্ষেত্রে তারা নারীদের প্রধান টার্গেট হিসেবে গ্রহণ করেছে।

---

১৯৩. How well do desired fertility measures for wives and husbands predict subsequent fertility? Rand 2003

১৯৪. এই রিপোর্টগুলো আজ থেকে ১৫ বছরেরও আগের। সে সময় জন্মহার দুইয়ে রাখার দাবি থাকলেও বর্তমানে এই সংখ্যা একে এসে দাড়িয়েছে। এখন একটি সন্তান নেওয়ার জন্যই সকলকে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

জন্মনিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট রিপোর্টগুলোতে আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো, তারা সেক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা (family planning), মাতৃত্ব পরিকল্পনা ও পিতৃত্ব পরিকল্পনার মতো পরিভাষা ব্যবহার করেছে। সরাসরি জন্মনিয়ন্ত্রণ কিংবা জন্মদানক্ষমতা হ্রাসকরণের মতো শব্দ তারা ব্যবহার করেনি। অথচ এটাই আসল প্রকৃত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারা নিজেদের মিশনকে সফল করার জন্য প্রথমে মানুষের কাছে শ্রুতিমধুর হয় এবং তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এমন একটি শব্দ বেছে নিয়েছে। যেন ব্যাপারটা কেবলই পরিকল্পনাগত; নিয়ন্ত্রণ কিংবা সীমাবদ্ধকরণ নয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ সময়টা থেকে পশ্চিমারা পরিভাষার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আসছে। পাশাপাশি জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটিকে স্বাভাবিক করার জন্য মিডিয়াগুলোও উল্লিখিত শব্দগুলো নিয়মিত প্রচার করে আসছে।

অবশ্য তারা কেবল উল্লিখিত শব্দগুলো বেছে নিয়ে ক্ষান্ত হয়েছে তা নয়; বরং প্রত্যেকটি শব্দের পেছনে তারা একটি নির্দিষ্ট মর্মকে সংযুক্ত করে দিয়েছে। নতুবা পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃত্ব পরিকল্পনা, পিতৃত্ব পরিকল্পনা প্রত্যেকটি শব্দ ব্যাপক অর্থ ধারণ করে। সন্তান লালনপালন, তাদের পড়াশোনা, পরিবারের দায়িত্ববণ্টনসহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এই শব্দগুলোর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু পরিবার পরিকল্পনা প্রজেক্টগুলোতে গর্ভধারণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারগুলোই বেশি গুরুত্ব পায়।

আর এভাবেই জন্মদানক্ষমতা হ্রাস ও জন্মনিয়ন্ত্রণের এজেন্ডা কোনো প্রকার বাধাবিঘ্ন ছাড়াই এগিয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের পরিভাষায় দুটি শব্দের জায়গায় ভিন্ন শব্দ বসিয়ে নিয়েছে। নিয়ন্ত্রণের জায়গায় পরিকল্পনা আর জন্মের জায়গায় পরিবার, মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব। যদিও পশ্চিমা কিছু রাষ্ট্র ও কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা জন্মনিয়ন্ত্রণ এজেন্ডার দায়িত্ব নিয়েছে। তবে তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে, স্বয়ং মুসলিম দেশগুলোর সরকারের ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ করতে। যেন তারা কোনো প্রকার বহিরাগত সাহায্য ও ফান্ডিংয়ের অপেক্ষায় বসে না থেকে নিজ থেকেই এসব এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে। আর তারা মুসলিম দেশগুলোর সরকারকে এই দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে সফলও হয়েছে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের পেছনে র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের রিপোর্টগুলোতে যেসব দাবি, যুক্তি ও উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছে, যেমন : মানুষের আয় বৃদ্ধি পাওয়া, দেশের সম্পদ ও অর্থনীতি সমৃদ্ধ হওয়া, সরকারের চাপ কমা—এগুলো কোনো

একাডেমিক আলাপ নয় এবং এই দাবিসমূহের কোনো ন্যায়নিষ্ঠ ভিত্তিও নেই। জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রজেক্টের পেছনে পশ্চিমা দেশসমূহ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যেই অর্থ ব্যয় করেছে, তারা যদি সেই অর্থ উল্লিখিত দাবিগুলোর পেছনে ব্যয় করত, তবে সেটা আসলেই কল্যাণকর হতো। যা-ই হোক, আমরা এখন জন্মনিয়ন্ত্রণের পেছনে র‍্যান্ড কর্পোরেশন যে দাবিগুলো উপস্থাপন করেছে, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

১. র‍্যান্ড কর্পোরেশনের প্রথম যুক্তি হলো, জন্মহারের ঊর্ধ্বগতি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং খাদ্য ও কর্ম-সম্ভাবনার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

নিশ্চয় মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং তাদের অনাগত বংশধরদের রিযিকের দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন। এজন্য পবিত্র কুরআনে তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের বর্তমান দরিদ্রতা ও ভবিষ্যতের আশঙ্কামূলক দরিদ্রতার রিযিকের ব্যবস্থাপনা তিনি করে রেখেছেন। তিনি বলেন,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.

'ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিজিক আল্লাহ নিজ দায়িত্বে রাখেননি। তিনি তাদের স্থায়ী ঠিকানাও জানেন এবং সাময়িক ঠিকানাও। সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।'[১৯৫]

এই দায়িত্ব নেওয়ার ফলে তিনি দরিদ্রতার আশঙ্কায় সন্তান হত্যাকে নিষেধ করেছেন। সুরা আনআমের ১৫১ নং আয়াতে ও সুরা ইসরার ৩১ নং আয়াতে এ বিষয়ে আলোচনা আছে। সুতরাং দরিদ্রতার আশঙ্কা কখনো জাতীয়ভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের কারণ হতে পারে না। এমনিভাবে সন্তানের আধিক্য কখনো দেশের কর্ম সম্ভাবনা, খাদ্য উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাধা হতে পারে না; বরং জনশক্তি মূলত এগুলোর ভিত্তি। চীনের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে।[১৯৬]

---

১৯৫. সুরা হুদ, আয়াত ৬

১৯৬. আশির দশকে চালু হওয়া এক সন্তাননীতির ফলে ৪০ কোটি অতিরিক্ত সন্তান জন্মগ্রহণ ঠেকায় চীন। কিন্তু এতে চীনের কর্মক্ষম জনসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। বৃদ্ধদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যাবিশিষ্ট দেশ হওয়া সত্ত্বেও শিল্প ও অর্থনৈতিক
সমৃদ্ধির দিক থেকে বিশ্বের প্রধান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো চীন।

যারা পশ্চিমাদের অন্ধ অনুসরণ করে না এবং বিকৃত চিন্তা নিয়ে গবেষণা পরিচালনা
করে না, এমন অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের মত হলো, জনসংখ্যা নিজেই একটি
গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সম্পদের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উৎস হলো জনশক্তি।[১৯৭] এমনকি
তারা এও বলেছে যে, যদি ১০ বছরের জন্য কোনো দেশে শিল্প পরিকল্পনা
যথার্থভাবে বাস্তবায়ন করা হয়, তবে কর্মক্ষেত্রগুলোতে জনসংখ্যার থেকেও
অধিক কর্মীর প্রয়োজন হবে। জমিনে কোনো সংকীর্ণতা নেই এবং কর্মসংস্থানেও
কোনো বেকারত্ব নেই। দোষ মানুষের পরিচালনার।[১৯৮]

এই বিষয়টি প্রমাণিত যে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি কারিগরি জ্ঞান ও তার ব্যবহারের
সম্ভাবনাকে সমৃদ্ধ করে। তা ছাড়া জনশক্তিকে যদি ইতিবাচকভাবে গড়ে তোলা
যায়, তাহলে তাদের মধ্য থেকেই নতুন নতুন যুবশক্তি বেরিয়ে আসবে। যারা
দেশ ও জনগণের বিদ্যমান অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে পারবে এবং আল্লাহর
ইচ্ছায় তারা কর্ম ও আবিষ্কারে নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।
যা সমাজের উন্নতিকে আরও দ্রুতগামী করবে। বিখ্যাত মুসলিম সমাজবিজ্ঞানী
ইবনে খালদুনও এই বাস্তবতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, অধিক
জনসংখ্যা অধিক কর্মসংস্থানের দিগন্ত উন্মোচন করে এবং এখানে সৃজনশীলতা ও
বহুত্ব নিয়ে আসে। যার ফলে তা দেশের সম্পদ, অর্জন, শক্তি ও সুখ বৃদ্ধি করে।[১৯৯]
এমনকি পশ্চিমা কিছু গবেষকও এই বাস্তবতাকে স্বীকার করেছে।[২০০]

থাকে। এজন্য মাঝখানে তারা দুই সন্তাননীতি প্রণয়ন করে। কিন্তু এই ধারাও এই প্রবণতাকে
প্রভাবিত করতে পারেনি। তাই তারা তিন সন্তাননীতি গ্রহণ করে এবং আগে সন্তান জন্মদানের
ব্যাপারে যত প্রকার কঠোরতা ছিল সেগুলো উঠিয়ে নিয়ে নানা প্রকার সুবিধা প্রণয়ন করতে থাকে। চীন
এক সন্তাননীতির ফলে চীনের নারীদের মধ্যে বাচ্চা গ্রহণের প্রতি চরম অনীহা তৈরি হয়েছে।
সেটা দূরীকরণের জন্যও পদক্ষেপ নিচ্ছে।
মূলত জন্মদানের হারকে কমিয়ে ফেলার ফলে দেশে কর্মক্ষম জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সংকট
দেখা দেয়। এজন্য রাশিয়াও রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্তান জন্মদানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে এবং অধিক
সন্তান জন্মদাতার জন্য বাৎসরিক পুরস্কারের ব্যবস্থা পর্যন্ত করেছে।

১৯৭. তানজিমুল উসরাহ ওয়া মাওকিফুশ শারিয়াতিল ইসলামিয়্যি মিনহা, পৃষ্ঠা ১১০
১৯৮. প্রাগুক্ত
১৯৯. মুকাদ্দিমাতু ইবনি খালদুন, দারু নাহদাতি মিশর, ২/৮৭১-৮৭৫
২০০. দেখুন, তানজিমুন নাসল ওয়া মাওকিফুশ শারিয়াতিল ইসলামিয়্যাতি মিনহা, পৃষ্ঠা ৩৯৫-৪১৪

জনসংখ্যার সমৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক সংকটের জন্য দায়ী করা একাডেমিক ফ্যালাসি। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর ঐতিহাসিক বাস্তবতাও এই দাবিকে অস্বীকার করে; বরং জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে জনসংখ্যার যে স্বল্পতা তৈরি হয়, সেটাকে অর্থনৈতিক মন্দার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ নবজাতক জনসংখ্যা নিম্নমুখী হওয়ার ফলে উৎপাদক জনগোষ্ঠীর থেকে ভোক্তা জনগোষ্ঠী বিশাল ব্যবধানে কমে যায় এবং এতে জিনিসের ডিমান্ড কমে, উৎপাদকদের কর্মসংস্থানও সংকুচিত হয়ে আসে।[২০১]

মূলত আল্লাহর জমিন কল্যাণে ভরপুর। জমিনের প্রাণীর সংখ্যা যতই হোক, জমিনে যেই পরিমাণ খাদ্য মহান আল্লাহ তাআলা বোঝাই করে দিয়েছেন, তা সকল প্রাণীর জন্যই যথেষ্ট হবে। এই বিশ্বাস না রাখা মূলত আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের সাথে সাংঘর্ষিক এবং এটি তাওয়াক্কুলেরও পরিপন্থি। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ.

‘বলে দাও, সত্যিই কি তোমরা সেই সত্তার সাথে কুফরি পন্থা অবলম্বন করছ, দুদিনে যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তার সাথে অন্যকে শরিক করছ? তিনি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক!

আর তিনি তার উপরিভাগে দৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং তাতে বরকত দিয়েছেন, এবং তাতে (বসবাসকারী) সকল রিজিক-প্রত্যাশীদের জন্য সুষমভাবে রিজিক সৃষ্টি করেন (আর এ সবকিছু তিনি করেন) চার দিনে।’[২০২]

কুরআন-সুন্নাহ থেকে উদঘাটিত মাকাসিদে শরিয়াহ এই কথার প্রমাণ করে যে, ইসলাম অর্থনীতিকে জনসংখ্যা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলে, অর্থনীতি অনুযায়ী জনসংখ্যাকে নয়।[২০৩]

---

২০১. দাবতুন নাসাল : আবআদুহু ওয়া আসারুহুদ দিমিগরাফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৪৫

২০২. সুরা ফুসসিলাত, আয়াত ৯-১০

২০৩. মাআলিমুশ শরিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ, ডক্টর সুবহী আস সালিহ, পৃষ্ঠা ২২৯

র‍্যান্ড কর্পোরেশন–যারা নিজেদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণের অগ্রদূত মনে করে–তারা কি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করার জন্য জন্মের পূর্বেই নবজাতককে কবর দেওয়া ছাড়া আর কোনো সমাধান খুঁজে পেল না? এটা কি তাদের রাজনৈতিক ও পরিচালনাগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা? কখনোই না; বরং বাস্তবতা হলো, এটা তাদের উপনিবেশবাদী প্রবণতার ফল। তারা মুসলিম বিশ্বের ও তৃতীয় বিশ্বের[২০৪] (তাদের ভাষায়) শক্তির উৎপাদককে ধ্বংস করে দিতে চায় এবং দূর থেকেই এই দেশগুলোকে অবরুদ্ধ ও দুর্বল করে রাখতে চায়। এটাই তাদের উপনিবেশবাদী স্বার্থ।

২. র‍্যান্ড কর্পোরেশনের আরেকটি দাবি হলো, অধিক জন্মদান নারী ও সন্তানের স্বাস্থ্যজনিত আশঙ্কাকে বাড়িয়ে দেয়।

সন্তানের আধিক্য কখনোই পৃথকভাবে নারী ও সন্তানের জন্য স্বাস্থ্যজনিত ঝুঁকির কারণ নয়। হ্যাঁ, নির্দিষ্ট কোনো মেয়ের জন্য এটা সমস্যাজনক হতে পারে বিভিন্ন কারণে। সাধারণভাবে উক্ত দাবিকে মূল বানানো যাবে না। যদি নির্দিষ্ট কোনো নারীর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ চিকিৎসক এই আশঙ্কা প্রকাশ করে, তবে বিষয়টা তার সাথেই বিশেষ হিসেবে বিবেচিত হবে। আর ইসলামি শরিয়াহর নির্দেশনা হলো, যার বিশেষ সমস্যা আছে সে শিথিলতা গ্রহণ করবে। কিন্তু বিষয়টাকে সাধারণ মূলনীতি বানিয়ে জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।[২০৫]

---

২০৪. তৃতীয় বিশ্ব বলতে বোঝায় বিশ্বের প্রধান দুটি সামরিক জোট—ন্যাটো [NATO] ও ওয়ারশ [Warsaw]-ভুক্ত নয় এমন রাষ্ট্রগুলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে বিশ্বে শুরু হয় স্নায়ুযুদ্ধ। এই যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো বাহিনী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে ওয়ারশ জোট গঠিত হয়। ন্যাটোর সহযোগী দেশ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন তথা পশ্চিম ইউরোপ; এদের বলা হয় প্রথম বিশ্ব। আর সোভিয়েতের পক্ষে থাকা চীন, কিউবা ও তাদের সহযোগীরা হলো দ্বিতীয় বিশ্ব। কোনো পক্ষে অংশ না নেওয়া আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, এশিয়া, ওশেনিয়ার দেশগুলি হলো তৃতীয় বিশ্ব।

তৃতীয় বিশ্ব নামের এই পরিভাষাটিও একটি উপনিবেশবাদী শব্দ। এই শব্দের মাধ্যমে তারা তৃতীয় বিশ্বকে অত্যন্ত নিচু ও নিকৃষ্ট ধরনের বুঝিয়ে থাকে। যেন এদের ওপর প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ ও খবরদারি একটি কল্যাণকর বিষয়। এদের নিজস্ব কোন আইডল থাকতে পারে না; বরং সর্বক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বকে আইডল মনে করবে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকে আশির্বাদ হিসেবে মেনে নিবে।

২০৫. তানজিমুল উসরাহ, পৃষ্ঠা ১০৮

তারা যদি ন্যায়বান হতো, তাহলে বলত যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলোর ব্যবহারই নারীর শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, গর্ভধারণ কিংবা সন্তানদানের আধিক্য নয়। নিষ্ঠাবান বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের বক্তব্য হলো, বন্ধ্যাকরণ নারীর স্বাস্থ্য ও শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর একটি বিষয়। এটি তাকে ক্যান্সারের মতো জটিল রোগে আক্রান্ত করতে পারে।[২০৬]

বিশেষ করে ইন্ট্রোয়ট্রাই ডিভাইস[২০৭] জরায়ু-সংক্রান্ত অনেক সমস্যাকে বাড়িয়ে দেয়। যেমন : পানি নিষ্কাশন, অধিক রজঃস্রাব, জরায়ু ছিদ্র হওয়া, পেট ব্যথা, জরায়ু ফুলে যাওয়া এবং তা মৃত্যুরও কারণ হতে পারে।[২০৮] জন্মনিরোধক ট্যাবলেটগুলোও নারীর জন্য ক্ষতিকর। প্রায়ই নারীর স্বাস্থ্যবিষয়ক ম্যাগাজিনগুলোতে নারীর শরীরের জন্য এই ট্যাবলেটগুলো কতটা ক্ষতিকর, তা নিয়ে গবেষণা প্রকাশিত হয়।

গর্ভধারণ নিয়ে এমন কিছু বিষয় আছে, যা পশ্চিমারা কখনোই অনুধাবন করতে পারবে না। এই রহস্য বুঝতে তারা অক্ষম। কারণ আখিরাত ও আল্লাহ সম্পর্কে তাদের বিশুদ্ধ ঈমান নেই। কিন্তু মুসলিম ফকিহরা ঈমানের দৌলতে আলোকিত। তাদের কাছে এই রহস্য দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট। আর সেটা হলো, সন্তানের আধিক্য ও তাদের মৃত্যু স্বল্প সন্তানের চেয়েও বেশি কল্যাণকর। এর অর্থ এটা নয় যে, নারী ও শিশুর সুস্থতার ব্যাপারে অবহেলা করা হবে। কখনই না। মহান আল্লাহ তাআলা মৃত্যুকে মুসিবত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ.

'হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের কারও মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হয় তখন ওসিয়ত করার সময় পারস্পরিক বিষয়াদি নিষ্পত্তি করার জন্য সাক্ষী

২০৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৪
২০৭. জন্মনিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে জরায়ুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট তারের ফাঁস বা প্যাঁচ।
২০৮. আল ইনফিজারুস সুক্কানিয়্য, পৃষ্ঠা ৭৩

বানানোর নিয়ম এই যে, তোমাদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়নিষ্ঠ লোক হবে (যারা ওসিয়ত সম্পর্কে সাক্ষী থাকবে), অথবা তোমরা যদি জমিনে সফরে থাকো এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যুর মুসিবত এসে যায়, তবে অন্যদের (অর্থাৎ অমুসলিমদের) মধ্য থেকে দুজন হবে। অতঃপর তোমাদের কোনো সন্দেহ দেখা দিলে তোমরা সে দুজনকে নামাজের পর আটকাতে পারো। তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলবে, আমরা এই সাক্ষ্যের বিনিময়ে কোনো আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করতে চাই না, যদিও বিষয়টা আমাদের কোনো আত্মীয়ের হয়। এবং আল্লাহ আমাদের ওপর যে সাক্ষ্যের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন আমরা তা গোপন করব না। করলে আমরা গুনাহগারদের মধ্যে গণ্য হব।'[২০৯]

কিন্তু যার শিশু মারা যায় সে এর বিনিময়ে প্রতিদান লাভ করবে। এবং এই শিশু কিয়ামতের দিন তার জন্য সম্পদ হিসেবে উপস্থিত হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে কাদের সন্তানহীন মনে করো? তিনি বলেন, আমরা বললাম যার সন্তান জীবিত থাকে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না সে সন্তানহীন নয়; বরং সন্তানহীন তো সেই পুরুষ, যে তার কোনো সন্তানকে তার জন্য অগ্রে পাঠায় না।'[২১০]

আরবদের ভাষায় সন্তানহীন হলো, যার কোনো সন্তান জীবিত থাকে না। আর হাদিসের মর্ম হলো, তোমরা মনে করছ সে ব্যক্তি সন্তানহীন, যে সন্তানের মৃত্যুতে শোকাহত। শরিয়াতের দৃষ্টিতে সে সন্তানহীন নয়; বরং যার কোনো সন্তান তার আগে মারা যায়নি, সে-ই প্রকৃত সন্তানহীন। কারণ সে তার সন্তানের মৃত্যুর শোক ও সবরের ফলে সওয়াব লাভ করত এবং এই সন্তান তার জন্য আখেরাতের অগ্রবর্তী সম্পদ হতো।[২১১]

শাহাদাতের মর্যাদা ইসলামে অনেক বড় একটি মর্যাদা। কোনো মহিলা যদি গর্ভধারণ কিংবা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়, ইসলাম তাকে শহিদি মর্যাদা দান করে। সে বিধানগতভাবে শহিদদের অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু

---

২০৯. সুরা মায়েদা, আয়াত ১০৬
২১০. সহিহ মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাবি, হাদিস ৬৬৪১
২১১. আল মিনহাজ বিশারহি সহিহিল মুসলিম, দারু ইবনে হাজম, পৃষ্ঠা ১৮৫৮

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর রাস্তায় যে নিহত হয়, সে শহিদ; মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি শহিদ; যে নারী গর্ভবতী হয়ে মারা যায় সেও শহিদ...।'[২১২]

৩. র‍্যান্ড কর্পোরেশনের আরেকটি দাবি হলো, অধিক জন্মহার পৃথিবীর মৌলিক উপাদানে বিরূপ প্রভাব ফেলে। যেমন এটা পান করার জন্য বিশুদ্ধ পানি কমিয়ে দেয়।

মহান আল্লাহ তাআলা যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে দুনিয়ায় পাঠান, তখন তাকে কোনো ক্ষুধার রাজ্যে পাঠাননি, যেখানে খাবার ও পানীয় কিছু নেই; বরং এই জমিনকে তিনি হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও তাঁর সন্তানদের জন্য সার্বিকভাবে প্রস্তুত করেই পাঠিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ.

'তিনি তার উপরিভাগে দৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং তাতে বরকত দিয়েছেন, এবং তাতে (বসবাসকারী) সকল রিজিক-প্রত্যাশীদের জন্য সুষমভাবে রিজিক সৃষ্টি করেছেন (আর এ সবকিছু তিনি করেন) চার দিনে।'[২১৩]

আল্লাহর প্রস্তুতকৃত এই জমিন থেকে আদম আলাইহিস সালাম খাবার গ্রহণ করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সন্তানেরা খাবার আহরণ করে যাবে। মহান আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের নতুন নতুন বিভিন্ন কৌশল শিখিয়ে দেবেন, তাদের নিত্য নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ক্ষমতা দান করবেন এবং তাদের দুআ, ইস্তিগফার ও ইস্তিসকা[২১৪] এর মতো বিধান দেবেন।[২১৫]

২১২. সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল জানায়েয, হাদিস ৩১১১

২১৩. সুরা ফুসসিলাত, আয়াত ১০

২১৪. ইস্তিসকা বলা হয়, আল্লাহর কাছে বিশেষ পদ্ধতিতে বৃষ্টি প্রার্থনাকে। যখন অনাবৃষ্টির কারণে জমিনে খরা সৃষ্টি হয়, জমি-ফসল ক্ষতির শিকার হওয়ার উপক্রম হয় এবং জনদুর্ভোগ তৈরি হয়, তখন মুসলমানদের কোনো ইমাম সাধারণ মুসলিমদের নিয়ে একটি মাঠে জমায়েত হন এবং দুই রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে সম্মিলিতভাবে কান্নাকাটি করে বৃষ্টি প্রার্থনা করেন। এটাকেই ইস্তিসকা বলে।

২১৫. অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার তথা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে রিজিক বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলেন,

জন্মনিয়ন্ত্রণের আয়োজকরা মনে করে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রাকৃতিক সম্পদকে ফুরিয়ে আনে, পরিবেশের অবক্ষয় ঘটায় এবং দেশের আয় কমিয়ে দেয়। বাস্তবতা হলো, প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জনসংখ্যার চাপ মানুষকে নতুন প্রাকৃতিক সম্পদের তালাশ ও অনুসন্ধানের পথ দেখায়। যেন এর মাধ্যমে তারা বিদ্যমান সংকটকে মোকাবিলা করতে পারে। উপরন্তু নতুন কোনো প্রাকৃতিক উৎস উদ্ভাবনের ফলে মানুষ একদিকে নতুন উৎস থেকে সুবিধা গ্রহণ করে পুরোনো উৎস নিঃশেষ হওয়ার আশঙ্কা কমাতে পারে এবং অন্যদিক থেকে ব্যবহৃত উৎসের ওপর যেই চাপ, সেটাকেও হালকা করতে পারে।[২১৬]

মহান আলাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মেধায় ও হৃদয়ে তাদের জীবনাচার ও প্রাচুর্যের সাথে উপযোগী নিত্য নতুন পদ্ধতি ঢেলে দেন। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে, আল্লাহর ইচ্ছায় ততই তাদের আবিষ্কার, অনুসন্ধান, উদ্ভাবন বেড়ে যাবে। এটাই পৃথিবীতে আল্লাহর নিয়ম। তবে মানুষ যদি অপরাধে লিপ্ত হয়, এর সুষ্ঠু ব্যবহার না করে; বরং ফাসাদ ও জুলুমকে বিস্তার করে, তখন তারা নানামুখী সংকট ও আজাব থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে না। এটাও পৃথিবীতে আল্লাহর সুন্নাহের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়।

জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ইসলামি শরিয়াহর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সন্তান-সন্ততির আধিক্য ইসলামে একটি প্রশংসনীয় ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়। ফলে ইসলাম ব্যাপকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুমোদন দেয় না। তবে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কারও যৌক্তিক সমস্যা থাকলে, সে সাময়িকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। যেমন, সন্তান কিংবা মায়ের প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকা, ফিতনা-ফাসাদের জমানার কারণে বাচ্চা অসৎ চরিত্রের হওয়ার আশঙ্কা থাকাসহ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার কারণে অস্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

‘আমি তাদেরকে বলেছি, নিজ প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চিতভাবে জানো, তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে উন্নতি দান করবেন। আর তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যান এবং তোমাদের জন্য নদ-নদীর ব্যবস্থা করে দেবেন। (সুরা নুহ, আয়াত ১০-১২)

এই বিষয়টি একটি হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও সুস্পষ্ট করে বলেছেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগফার করবে তথা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, আল্লাহ তাকে সব সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন, সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে তার রিজিকের ব্যবস্থা করে দেবেন। —ইবনে মাজাহ, হাদিস ৩৮১৯

২১৬. দাবতুন নাসাল : আবআদুহু ওয়া আসারুহুদ দিমিগরাফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৩৮

তবে নিজেদের শরীরের সৌন্দর্য ঠিক রাখা, অধিক বাচ্চার কারণে লজ্জাবোধ করা, সন্তান গর্ভধারণ ও প্রতিপালনের কষ্ট থেকে বেঁচে থাকা, অভাব অনটন বেড়ে যাওয়ার ধারণা রাখা, এই ধরনের কোনো কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

আর স্থায়ীভাবে প্রজননক্ষমতা নষ্ট করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। এক যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম যৌনচাহিদা পূরণের ব্যবস্থা না পেয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চিরতরে যৌনশক্তি নষ্ট করে ফেলার অনুমতি চান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেন এবং তাদের এই আয়াত পাঠ করে শোনান,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

'হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসকল উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করেছেন, তাকে হারাম সাব্যস্ত করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।'[২১৭]

তবে যদি জরায়ুতে এমন কোনো রোগ হয়, যা থেকে অপারেশন ব্যতীত পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব না, তাহলে জরায়ু কেটে ফেলা জায়েয আছে।

ওপরের বিধানগুলো একদম ব্যক্তি পর্যায়ের। সুনির্দিষ্টভাবে কেউ কেউ এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণকে একটি আন্তর্জাতিক পলিসি বানিয়ে, নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করে স্লোগান তৈরি করে ব্যাপকভাবে গর্ভধারণ ও সন্তান গ্রহণের প্রতি ভীতি ও অনাগ্রহ তৈরি করার যেই কালচার, এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই; বরং এটা পশ্চিমা বিশ্বের উপনিবেশবাদী রাজনীতির অংশ।

যখন আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে প্রাকৃতিক যেই সম্ভাবনা তৈরি করে রেখেছেন এবং যুদ্ধ, মহামারির পাশাপাশি জন্ম-মৃত্যুর মতো যেই ন্যাচারাল রিপ্লেসমেন্ট সিস্টেম (প্রাকৃতিক প্রতিস্থাপন ব্যবস্থা) দিয়েছেন, এর ভেতর মানুষের স্বাভাবিক জন্মদানক্ষমতা কখনো সমস্যাজনক হতে পারে না। জন্মনিয়ন্ত্রণের অফিশিয়াল আয়োজক উপনিবেশবাদীরা জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে যেসব সমস্যার কথা

২১৭. সূরা মায়িদা, আয়াত ৮৭; বুখারি, হাদিস ৫০৭৫

উল্লেখ করে, সেসবের সাথে প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যার সম্পর্ক নেই বললেই চলে; বরং অধিকাংশ সমস্যাগুলোই তৈরি হয়েছে ভিন্ন কোনো কারণে। অপ্রাকৃতিক শিল্পব্যবস্থা, দেশের ম্যানেজমেন্ট-ব্যবস্থা, বিশেষভাবে বললে পুঁজিবাদীদের উপনিবেশবাদী ও জুলুমতান্ত্রিক রাজনীতিই স্বয়ং উক্ত সমস্যাগুলোর জন্য দায়ী।

সারাংশ :

র‍্যান্ড কর্পোরেশন জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে যতগুলো যুক্তি দেখিয়েছে, তার সবগুলোই অবান্তর। এই দাবিগুলোর কোনো একাডেমিক ভিত্তি নেই। মুসলিম দেশগুলোতে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলো ছড়ানো এবং এগুলোর ব্যবহারকে কোনো প্রকার ডাক্তারি পরামর্শ ছাড়া ব্যাপক করার যেই প্রজেক্ট, এটা সম্পূর্ণ উপনিবেশবাদী একটি প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টে নারীর সুখ ও সুস্থতা, দেশের প্রকৃত উন্নতি ও সমৃদ্ধির সৎ চিন্তা থেকে উপনিবেশবাদী স্বার্থ বাস্তবায়নই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। র‍্যান্ড কর্পোরেশনের দাবিগুলো শত বছর আগে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ ও প্রাচ্যবাদের চিন্তারই পুনরাবৃত্তি। তবে তারা কেবল সেই চিন্তার বাস্তবায়ন, পদ্ধতি ও ভাষায় নতুনত্ব নিয়ে এসেছে মাত্র।

সুতরাং মুসলিম নারীদের দায়িত্ব হলো, শত্রুরা যেই চক্রান্তের বীজ আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে, সেটাকে ভালোভাবে অনুধাবন করা এবং তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও লক্ষ্যে পৌঁছার সহযোগী না হওয়া; বরং মুসলিম উম্মাহর শক্তিকে বৃদ্ধি করা এবং নিজের সন্তানদের সৎ, যোগ্য ও শক্তিশালী মুমিন হিসেবে গড়ে তোলা। ক্যারিয়ার, সৌন্দর্য ইত্যাদির নেশায় নারীদের মাঝে মাতৃত্বের প্রতি যেই অনীহা সৃষ্টি হচ্ছে, সেটাকে দূর করার জন্য আমাদের বোনদেরই এগিয়ে আসতে হবে। মাতৃত্বকে অনেকে বন্দিত্ব হিসেবেও প্রচার করছে। মুসলিম বোনদেরই মাতৃত্বের স্বাদ ও তৃপ্তিকে নারীদের উপভোগ করাতে হবে। মাতৃত্বের পবিত্র ও পরম অনুভূতি মুসলিম তরুণীদের মাঝে জাগ্রত করতে হবে।

উপসংহার :

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত পুরো বইটিতে মুসলিম নারীদের সম্পর্কে আমেরিকান প্রাচ্যবাদী সংস্থা র‍্যান্ড কর্পোরেশনের বেশ কিছু রিপোর্টের অবস্থান ও তার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। পূর্বের আলোচনা থেকে আমাদের সামনে কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়। নিম্নে পয়েন্ট আকারে আমরা সেগুলো তুলে ধরছি–

১. র‍্যান্ড কর্পোরেশনসহ ইউরোপীয় বিভিন্ন প্রাচ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী সংস্থাগুলো মনে করে, মুসলিম বিশ্বে নারী-অধিকারের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া আমেরিকার দীর্ঘমেয়াদি স্ট্রাটেজিক উদ্দেশ্যে পরিণত হতে হবে।

২. র‍্যান্ড কর্পোরেশনসহ তার সহযোগী দল ও সংস্থাগুলো মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা নারী-অধিকারের যেই ধারণা চাপিয়ে দিতে চায়, তারা সেটার অগ্রগতি ও অবনতির সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করে এবং তারা ভালো করেই জানে যে, ইসলামি শরিয়াহ নারী-অধিকারের পশ্চিমা কনসেপ্টের সাথে পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক।

৩. এজন্য র‍্যান্ড কর্পোরেশনসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো মুসলিম নারীদের, বিশেষত লিবারেল ও সেকুলারদের ইসলামি শরিয়াহর বিরুদ্ধে জনমত ও আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আহবান জানায়।

৪. র‍্যান্ড কর্পোরেশনসহ প্রাচ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী সংস্থাগুলো মুসলিম বিশ্বে নারী-অধিকারের বিষয়টিকে চিন্তাযুদ্ধ চালানোর জন্য প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে।

৫. র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের চিন্তাযুদ্ধের জন্য মুসলিমদের ভেতর থেকে একদল সেনা তৈরি করছে। প্রচলিত পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা ও ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিগুলো এই ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। তাদের পরিকল্পনা হলো, বহিরাগত কোনো পক্ষের পরিবর্তে যেন ভেতরের এই এজেন্ডাগুলোই ইসলামের বিরুদ্ধে চিন্তাযুদ্ধকে পরিচালনা করে এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদ ও বিভিন্ন প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানে যেন এদেরই কর্তৃত্ব থাকে।

৬. র‍্যান্ড কর্পোরেশন মনে করে, মুসলিম নারীদের অধিক হারে রাজনীতিতে প্রবেশ ও সক্রিয় হওয়ার দ্বারা খুব সহজেই কিছু কিছু শরিয়াহ আইনকে সংস্কার করা যেতে পারে। এজন্য তারা মুসলিম নারীদের, বিশেষত নারীদের মধ্যে যারা দুর্বল দীনি চেতনার অধিকারী, তাদের রাজনীতি ও বিচার কার্যালয়ে অধিক হারে অংশগ্রহণ করে দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য আহবান জানায়।

৭. নারী-অধিকারের দাবির ক্ষেত্রে তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট বস্তুনিষ্ঠ কোনো ব্যাখ্যা নেই। যেই ব্যাখ্যা নারীর নিরাপত্তা ও শান্তি কিংবা সমাজের উন্নতি-অগ্রগতিকে নিশ্চিত করতে পারে।

৮. র‍্যান্ড কর্পোরেশনসহ প্রাচ্যবাদী প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণা পদ্ধতিতে ন্যায়নিষ্ঠতা ও বস্তুনিষ্ঠতা বলতে কোনো কিছু নেই। তাদের এসব গবেষণাতে ঔপনিবেশিক স্বার্থ বাস্তবায়ন ও রাজনৈতিক পলিসি তৈরিকরণ ছাড়া আর কিছু নেই।

৯. তারা নারীদের বিশেষ করে এমন সব সেক্টরে নিয়ে আসতে চায়, ইসলামি শরিয়াহ যার অনুমোদন দেয় না এবং নারীদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য যাকে গ্রহণ করে না। যেমন : রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারকের আসন, সাধারণ নেতৃত্ব, ডিফেন্স বিভাগ ইত্যাদি।

১০. র‍্যান্ড কর্পোরেশনসহ পশ্চিমা বিশ্ব নারী-অধিকার নিয়ে এত সরব হওয়ার উদ্দেশ্য কখনোই নারীকে তার প্রাপ্য ফিরিয়ে দেওয়া কিংবা নারীর দেহ ও মনের প্রকৃতির প্রতি লক্ষ রেখে তার অধিকার নিশ্চিত করা নয়। তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো, তাদের উপনিবেশবাদী ও পুঁজিবাদী স্বার্থ বাস্তবায়ন করা।

১১. র‍্যান্ড কর্পোরেশন মনে করে, সমাজ ও দেশের উন্নতি সকল সেক্টরে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে হওয়া উচিত। এজন্য তারা ফ্রি-মিক্সিং

পরিবেশে নারীর কর্মের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যদি ফ্রি-মিক্সিং পরিবেশ বেশি বিরোধিতার মুখে পড়ে, তাহলে সাময়িকভাবে এবং পর্যায়ক্রমে ফ্রি-মিক্সিংয়ের পরিবেশে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পৃথক কর্মসংস্থানকে তারা গ্রহণ করে।

১২. ঐতিহাসিক রীতি, মুসলিম উলামায়ে কেরামের মতামত ও পশ্চিমা কিছু গবেষকদের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, মহিলাদের থেকে ঘরকে বিরান করে রাখা ও ফ্রি-মিক্সিংয়ের সংস্কৃতি চালু হওয়া সামাজিক অনেক ক্রাইসিসের জন্ম দেয়, আল্লাহর শাস্তি নামিয়ে আনে এবং একটি সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয়।

১৩. র‍্যান্ড কর্পোরেশনের রিপোর্টগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিশ্বব্যাপী মুসলিম নারীরা তাগরীবি বা ওয়েস্টার্নাইজেশন প্রজেক্টের শিকার হচ্ছে। যেই প্রজেক্টে তার দীন, সত্তা, পর্দা সবকিছুকে ধ্বংসের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৪. নারী বিষয়ে পশ্চিমা বিশ্ব ও তাদের দোসরদের সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব অত্যন্ত বিস্তৃত একটি ক্ষেত্র পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। রাজনীতি, শাসনব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, মিডিয়া, দাতব্য সংস্থা–এই সবকিছু বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের সাথে জড়িত। সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিক এই লড়াইয়ে বিজয়ী হতে হলে আমাদের উল্লিখিত সব দিক নিয়েই কাজ করতে হবে।

১৫. র‍্যান্ড কর্পোরেশন মুসলিম বিশ্বে নারী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পশ্চিমা সংস্কার সাধনের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর দায়িত্বকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখিয়েছে। এবং এ ক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে বড় পলিসি হলো, স্থানীয় বিভিন্ন দাতব্য সংস্থাকে অর্থায়ন করা এবং তাদের পরিকল্পনা প্রদান করা।

১৬. নারী ও তার পশ্চিমা অধিকারকে র‍্যান্ড কর্পোরেশন গণতন্ত্র ও লিবারেল মতাদর্শ বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম হিসেবে গণনা করে।

১৭. র‍্যান্ড কর্পোরেশনসহ প্রাচ্যবাদী ও পশ্চিমা উপনিবেশবাদী সংস্থাগুলো মুসলিম নারীদের সেসব ইসলামি সরকার কিংবা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চায়, যারা আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহ দিয়ে সমাজ পরিচালনা করে কিংবা করতে চায়।

১৮. র‍্যান্ড কর্পোরেশন কিছু মুসলিম দেশে হিজাবের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করছে এবং এটিকে ইসলামকে কট্টরভাবে পালন করার

প্রবণতা বৃদ্ধির আলামত হিসেবে দেখছে। পাশাপাশি তারা কিছু মুসলিম তরুণীর হিজাব পরিত্যাগ এবং তা পরিত্যাগ করতে সহায়ক কারণগুলোও উদঘাটন করার চেষ্টা করছে।

১৯. র‍্যান্ড কর্পোরেশন মুসলিম নারীদের হিজাব দীনি ড্রেস হওয়ার দাবিকে প্রত্যাখ্যান করছে। তারা হিজাবকে কেবল একটি সামাজিক প্রথা হিসেবে দেখছে; বরং কেউ কেউ এটাকে রাজনৈতিক প্রতীক, এমনকি কেউ কেউ জঙ্গিবাদের আলামত হিসেবে চিহ্নিত করছে।

২০. র‍্যান্ড কর্পোরেশনের কিছু গবেষক এবং ইউরোপীয় কিছু দেশ হিজাবকে নারীর স্বাধীনতা হিসেবে কল্পনাই করতে পারে না। একজন নারী যত আগ্রহ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথেই হিজাবকে গ্রহণ করুক না কেন, এটাকে তারা ব্রেইনওয়াশ কিংবা জোরজবরদস্তির ফলাফল মনে করে।

২১. ঘনবসতি-সম্পন্ন মুসলিম দেশগুলোতে র‍্যান্ড কর্পোরেশন জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে বিশেষভাবে গবেষণা করেছে। যেমন : মিশর, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ইত্যাদি। মুসলিম দেশগুলোতে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে। আর এই প্রজেক্টে পরিবারের প্রধান খুঁটি হিসেবে তারা নারীদের টার্গেট বানিয়েছে।

২২. জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রজেক্টে তাদের টার্গেট হলো, প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর গড়ে দুই সন্তানের বেশি না থাকা এবং নানাভাবে নারীদের জন্মদানের ক্ষমতা, সম্ভাবনা ও ইচ্ছা কমিয়ে আনা।

২৩. র‍্যান্ড কর্পোরেশন মনে করে, জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রজেক্টে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ হলো, জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া এবং এগুলোর ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

২৪. জন্মনিয়ন্ত্রণের পেছনে র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের রিপোর্টগুলোতে যেসব দাবি, যুক্তি ও উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছে, যেমন : মানুষের আয় বৃদ্ধি পাওয়া, দেশের সম্পদ ও অর্থনীতি সমৃদ্ধ হওয়া, সরকারের চাপ কমা, এগুলো কোনো একাডেমিক আলাপ নয় এবং এই দাবিসমূহের কোনো ন্যায়নিষ্ঠ ভিত্তিও নেই। সম্পূর্ণ এই প্রজেক্টে তাদের উদ্দেশ্য উপনিবেশবাদী স্বার্থ বাস্তবায়ন করা এবং মুসলিমদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ধ্বংস করা।

করণীয় :

মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুশরিকরা ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে আসছে। আমাদেরকে তাদের মতো কাফের বানানোর জন্য তাদের এই শত্রুতা কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। এটি আল্লাহর কুরআনের সুস্পষ্ট বাণী। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.

'ইহুদি ও নাসারা তোমার প্রতি কিছুতেই খুশি হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। বলে দাও, প্রকৃত হিদায়াত তো আল্লাহরই হিদায়াত। তোমার কাছে (ওহির মাধ্যমে) যে জ্ঞান এসেছে, তারপরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো, তবে আল্লাহর থেকে রক্ষা করার জন্য তোমার কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং সাহায্যকারীও না।'[২১৮]

আমরা যদি আধুনিক ইতিহাসের প্রতি লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাব, কীভাবে পশ্চিমা বিশ্ব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিধি-নিয়মের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে

---

২১৮. সুরা বাকারা, আয়াত ১২০

রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। এগুলো কোন ষড়যন্ত্রতত্ত্ব নয়; বরং ওপেন সিক্রেট। স্বয়ং পশ্চিমারাও এই বিষয়গুলো অস্বীকার করবে না।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা নতুন কিছু নয়; বরং পবিত্র কুরআনেও আমরা এর উপস্থিতি দেখতে পাই। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ.

> ‘(তারপরের বৃত্তান্ত এই যে) নগরের বিলকুল দূর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে আসল ও বলল, হে মুসা! নেতৃবর্গ তোমাকে হত্যা করার জন্য পরামর্শ করছে। সুতরাং তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। বিশ্বাস করো, আমি তোমার কল্যাণকামীদের একজন।’[২১৯]

কিন্তু বর্তমান সময়ে সেকুলার, লিবারেল ও মডার্নিস্টদের অনেকে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে উপহাসের অবস্থান গ্রহণ করেছে। তারা এই বলে তিরস্কার করে যে, মুসলিমরা সবকিছুতেই ষড়যন্ত্র খোঁজে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কিছু লোক ষড়যন্ত্র নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করে। কিন্তু ষড়যন্ত্রের বিষয়টিকে একেবারেই নাকচ করে দেওয়া বাস্তবতাকে অস্বীকার করা ছাড়া কিছুই না। যারা ষড়যন্ত্রকে অস্বীকার করে, দেখা যাবে তাদের অধিকাংশই হয়তো পশ্চিমাদের এজেন্ট ও তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী কিংবা তারা পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি মুগ্ধ ও অনুরাগী। ব্যতিক্রম কিছু ছাড়া সবাইকে আপনি এই ক্যাটাগরিতে খুঁজে পাবেন।

ষড়যন্ত্রতত্ত্ব নিয়ে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ বক্তব্য হলো, সাধারণভাবে ষড়যন্ত্রকে অস্বীকার করা ষড়যন্ত্রের অংশ। আর ষড়যন্ত্র নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হলো ষড়যন্ত্রে সহায়তা করা।[২২০] এজন্য যারা ষড়যন্ত্রতত্ত্ব দিয়ে মুসলিমদের নিয়ে উপহাস করে তাদের অধিকাংশ নিজেরাই এই ষড়যন্ত্রের অংশ (জেনে কিংবা না জেনে, বুঝে কিংবা না বুঝে)। আর র‍্যান্ড কর্পোরেশনের রিপোর্টগুলো থেকে এই বাস্তবতা আরও সুস্পষ্ট হয়ে যায় আমাদের সামনে।

---

২১৯. সুরা কাসাস, আয়াত ২০

২২০. বক্তব্যটি ড. সালেহ আব্দুল্লাহ আল গামেদি র‍্যান্ড কর্পোরেশন নিয়ে তার প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থে ড. রুকাবি থেকে উদ্ধৃত করেছেন। হাফিজাহুমাল্লাহ।

আর যারা ষড়যন্ত্র নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে শত্রুদের ব্যাপারে মুমিনদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করে এবং সেই ষড়যন্ত্রগুলোকে অজেয় ও অধরা বানিয়ে মুসলিমদের সামনে উপস্থাপন করে, তারা হলো ষড়যন্ত্রের সহায়তাকারী (বুঝে কিংবা না বুঝে)।

আমরা বিশ্বাস করি কাফেররা প্রতিনিয়ত আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে যাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ হলেন সেসব চক্রান্তের উত্তম প্রত্যুত্তরদাতা। ফলে তাদের ষড়যন্ত্র হলো মাকড়সার জালের মতো দুর্বল। আমাদের দায়িত্ব হলো, সচেতনতার সাথে সেগুলোর মোকাবিলা করে যাওয়া। আল্লাহ তাআলাই তাদের সকল পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দেবেন।

সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এখানে মুসলিম-সমাজ, বিশেষত মুসলিম নারীদের জন্য করণীয় কিছু বিষয় তুলে ধরব—

১. বিকৃত নারীবাদী আন্দোলন ও ইসলামি শরিয়াহবিরোধী নারী-অধিকারের দাবি উত্তোলনকারী প্রত্যেক প্রচেষ্টা, স্লোগান ও সংস্থার বিরুদ্ধে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করা।

২. কর্মের প্রতি মুখাপেক্ষী নারীদের জন্য শরিয়াহবান্ধব পরিবেশ ও সেক্টরের ব্যবস্থা এবং তার দাবিকে জোরদার করা। পাশাপাশি এমন বোনদের বৈধ সেক্টরগুলোর প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং ইসলামি শরিয়াহ কর্তৃক নিষিদ্ধ সেক্টরগুলো থেকে বিমুখ করে তোলা।

৩. নারী সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে অনলাইন ও অফলাইনভিত্তিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা এবং এই ক্ষেত্রে দুটি পর্যায়ে কাজ করা। প্রথমত, ইসলামি শরিয়াহর প্রতি নারীর সম্মান ও গর্বকে ইতিবাচকভাবে বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয়ত, নারীবিষয়ক সেকুলার, লিবারেল ও ফেমিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর অসারতা ও ভ্রান্তিকে সুস্পষ্ট করা।

৪. মুসলিম নারীদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু বোনদের তৎপর হওয়া উচিত, যারা আদর্শ ও ইলমি যোগ্যতায় উত্তীর্ণ। এ সমস্ত বোনরা মুসলিম তরুণীদের মাঝে ইসলামি শরিয়াহর বিধানগুলো আপসহীনভাবে হৃদয়ঙ্গম করে বোনদের সামনে তুলে ধরবেন। তারা প্রভাব বিস্তারকারী হবেন, প্রভাবিত হবেন না। তাদের বক্তব্য হবে সুস্পষ্ট, যেখানে থাকবে না পশ্চিমা সংস্কৃতির কাছে নতি স্বীকার। এর জন্য

তারা সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমসহ বিভিন্ন প্লাটফর্ম ব্যবহার করবেন। নারীদের জন্য বিশেষ একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে তার আওতায় নারী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স ও কর্মশালার আয়োজন করবেন।

৫. বিদ্যমান সমাজে নারীরা যেসব অন্যায় ও জুলুমমূলক আচরণের শিকার হয়, তার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং ইসলামি শরিয়াহর বিরুদ্ধে না গিয়ে বরং ইসলামি শরিয়াহর আলোকেই তার সমাধান বাস্তবসম্মতভাবে পেশ করা। বিশেষত নির্দিষ্টভাবে যেসব নারী এমন পরিস্থিতির শিকার, কল্যাণ ও সংশোধনের মানসিকতা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের প্রতি হওয়া জুলুমকে নির্মূল করে তাদের জন্য ইনসাফ নিশ্চিত করা।

৬. নারীদের অন্তরে ওয়ালা-বারার আকিদাকে গেঁথে দেওয়া।

৭. দলবদ্ধভাবে কিংবা সংস্থারূপে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর ইসলামবিরোধী স্বার্থসমূহের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং মুসলিম বিশ্বের ভেতরগত বিষয়ে সেসব সংস্থার অনুপ্রবেশকে না বলা।

৮. মুসলিম তরুণীদের হায়া, তহারাত ও পর্দার ওপর প্রতিপালন করা। নারীত্ব ও মাতৃত্ব বিষয়ে ইলমি ও তরবিয়তি তৎপরতা বৃদ্ধি করা, যার মাধ্যমে নারীত্ব ও মাতৃত্বে তার ইবাদাত ও স্বভাবজাত দিকগুলো ফুটে উঠবে। বিশেষত মুসলিম নারীদের মাঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা ও আনুগত্যকে গভীর করে তোলা।

৯. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নারী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

১০. মুসলিম নারীদের জন্য জরুরি হলো, উপনিবেশবাদী ও প্রাচ্যবাদী সংস্থাগুলো তাদের ওয়েস্টার্নাইজেশন তথা পশ্চিমায়নের জন্য যত চক্রান্ত আবিষ্কার করেছে, সেগুলো ভালোভাবে চিনে নেওয়া এবং তাদের এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে না দেওয়া।

১১. জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর যেই অসৎ উদ্দেশ্য, সেটাকে অনুধাবন করা। মুসলিম উম্মাহর জনশক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের হুমকি-ধমকিতে প্রতারিত না হয়ে, বরং আল্লাহর রাসুলের গর্বের ব্যবস্থা করা। নিজের

সন্তানদের সৎ ও সাহসী মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং সেজন্য বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা।

১২. নারীবাদী আন্দোলনগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে জানা এবং এগুলোর ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তোলা।

১৩. নারীদের নিয়ে প্রাচ্যবাদী গবেষণাসমূহের বিরুদ্ধে মুসলিমদের গবেষণা ও পর্যালোচনা তৈরি করা এবং সেগুলো মুসলিম নারীদের ভেতর ছড়িয়ে দেওয়া।

১৪. মুসলিম দেশগুলোতে কেবল নারীদের জন্য বিভিন্ন সংঘ, ইন্সটিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। যারা মুসলিম নারীদের পশ্চিমায়নের হাত থেকে বাঁচাতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও ইলমি প্রাচীর তৈরি করবে। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে প্রভাবিত মুসলিম বোনদের নীড়ে ফেরানোর জন্য পলিসি প্রস্তুত করবে এবং আধুনিক নারীবাদী সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে নারীদের ভেতর জাগরণ সৃষ্টি করবে।

১৫. প্রত্যেক নারীকে তার সামাজিক দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে তোলা। যাতে সে পরিবার গঠনে এবং পরিবারের ও সন্তানদের লালনপালনে উত্তম অবদান রাখতে পারে। পাশাপাশি তাদের সমাজের নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের কাজের যোগ্য করে তুলতে হবে। কেননা আমাদের পরিবারগুলোকে, মায়েদের ও নারীদের তাদের প্রকৃত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পন্থা শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আর এই মহান সংস্কারমূলক কাজে পুরুষদের চেয়ে নারীরাই অধিকতর উপযোগী ও সক্ষম।[২২১]

১৬. বিশেষভাবে সমাজের পুরুষদের একটি দায়িত্ব হলো, নারীর পারিবারিক মর্যাদা নিশ্চিত করা। নারীকে পশ্চিমা ভোগবাদী দর্শনের মতো নিছক উৎপাদক যন্ত্র হিসেবে না দেখা। বর্তমান সময়ে নারীদের পরিবার থেকে বের করার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি হলো, পরিবারে তার অবদান খাটো করা। অর্থনৈতিকভাবে কিংবা উপার্জনের দিক থেকে তার অবদানকে মূল্যায়ন না করা। পুরুষদের এই জঘন্য মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নারীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব নেওয়া পুরুষকর্তৃক নারীর ওপর কোনো প্রকার অনুগ্রহ নয়; বরং এটা তার আবশ্যিক দায়িত্ব। যা মহান আল্লাহ তাআলা তার ওপর ধার্য করেছেন।

---

২২১. আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন, পৃষ্ঠা ১৩৫

বড় দুঃখজনক ব্যাপার হলো, প্রকৃতি নারীকে সর্বাধিক মূল্যবান যে জিনিসটি দিয়েছে সেটাই সে হারাতে বসেছে। সে জিনিসটি হচ্ছে তার নারীত্ব। এটা হারিয়ে সে সমস্ত সুখ-শান্তিও হারাচ্ছে। পরিবার হচ্ছে নারী-পুরুষ উভয়ের স্বাভাবিক সুখের নীড়। মাতা ও গৃহিণীর তদারকি ছাড়া এই সুখের নীড় টিকে থাকতে পারে না। পরিবারই সমাজের ও ব্যক্তির সুখের উৎস । পরিবারই কল্যাণ, মেধা ও প্রজ্ঞার সুতিকাগার।

আমাদের দুটো দর্শনের মধ্য থেকে যেকোনো একটাকে বেছে নিতে হবে। একদিকে রয়েছে ইসলামের দর্শন, যা নারীর মর্যাদা ও সম্ভ্রমের উৎকৃষ্টতম রক্ষক, এবং যা তাকে স্ত্রী ও মা হিসেবে তার সামাজিক দায়িত্ব একাগ্রভাবে পালন করার সুযোগ দেয়। আর এরই বিনিময়ে সমাজকে তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে ও তার সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে বাধ্য করে। এজন্য ইসলাম স্বামীর ওপর কিংবা স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনের ওপর স্ত্রীর ও তার সন্তানদের ভরণপোষণের ভার অর্পণ করে। এতে নারীর অবমাননা কিংবা অবমূল্যায়নের প্রশ্নই ওঠে না। কেননা নারী সেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্বটা পালন করে, যা মানব জাতির সুখ-শান্তি ও উন্নয়নের একমাত্র রক্ষাকবচ।

অন্যদিকে আছে পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুবাদী ও ভোগবাদী দর্শন। এই দর্শন নারীর জৈবিক দাবির ব্যাপারে তার ওপর কঠোর নিষ্পেষণ, নিপীড়ন চালায়। স্ত্রী ও মা হিসেবে তার স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তার নিজের জীবিকাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে কঠোর পরিশ্রমে তাকে বাধ্য করে। তার নারীত্ব নষ্ট করে তাকে পণ্য কিংবা যন্ত্রে রূপান্তর করে। এভাবে নারী নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার সন্তানরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সামগ্রিকভাবে সমাজে পারিবারিক জীবনের স্থিতিশীলতা, সংহতি ও বন্ধন নিদারুণভাবে ব্যাহত হয়।

আমরা যারা মুসলিম, তাদের পক্ষে তো ইসলাম ও তার জীবন বিধানের চেয়ে অন্য কিছুকে অধিকতর কল্যাণকর মনে করা সম্ভবই না। কারণ মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'ওরা কি তবে জাহিলিয়াতের বিধিবিধান চায়? মুমিনদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে হতে পারে!'[২২২] [২২৩]

---

২২২. সুরা মায়েদা, আয়াত ৫০

২২৩. আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন, পৃষ্ঠা ১২৩-১২৪

শত্রুরা আমাদের ওপর যেই কৌশল বারবার অবলম্বন করে সফল হতে চাচ্ছে, আমাদের উচিত নয় তার মাধ্যমে প্রতারিত হওয়া। যেমনটা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুমিন কখনো একই ফাঁদে দ্বিতীয়বার ধোঁকা খেতে পারে না।'[২২৪] এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদিসে উদাসীন না থাকা এবং নিজেদের মেধা ব্যবহার করার নির্দেশনা আছে।[২২৫] মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ.

'আর তিনিই কিতাবিদের মধ্যে যারা কাফের, তাদের প্রথম সমাবেশেই তাদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছেন। (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কল্পনাও করোনি তারা বের হয়ে যাবে। তারাও মনে করেছিল, তাদের দুর্গগুলি তাদের আল্লাহ হতে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ তাদের কাছে এমন দিক থেকে আসলেন, যা তারা ধারণাও করতে পারেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতিসঞ্চার করলেন। ফলে তারা নিজেদের হাতে নিজেদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে ফেলেছিল এবং মুসলিমদের হাতেও। সুতরাং হে চক্ষুষ্মানেরা, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো!'[২২৬]

বর্তমানে মুসলিমরা যেসব আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে, তার সবগুলোর সূত্র আমরা আধুনিক ইতিহাসের সূচনালগ্নেই খুঁজে পাব। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেসব আগ্রাসন আজও বহাল আছে। বদলেছে ভাষা, পাল্টিয়েছে নাম। আগে যেটা হতো প্রাচ্যবিদের নামে, এখন সেটা চলছে গবেষকের নামে। এখন উপনিবেশের নাম হয়েছে ওয়ার অন টেরর। আমরা যদি তাদের কর্মকৌশলগুলোর বাস্তবতা বুঝতে পারি, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের আগ্রাসনকে আমরা খুব সহজেই প্রতিরোধ করতে পারব। এজন্য এসব বিষয়ে আমাদের দায়ীদের মাঝে যথেষ্ট

২২৪. মুসলিম, হাদিস ৭৪৮৮
২২৫. ফাতহুল বারি, দারুর রাইয়্যান, ১০/৫৪৭ পৃষ্ঠা
২২৬. সুরা হাশর, আয়াত ২

সচেতনতা তৈরি করতে হবে এবং তাদের সমস্ত প্রকার আগ্রাসন নিয়ে নিজেদের মধ্যে গবেষণা চালু রাখতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম উম্মাহর মাঝে আমরা সচেতনার এক জোয়ার দেখতে পাচ্ছি। এই জোয়ারকে আরও বেগবান ও মজবুত করতে হবে। যেন উম্মাহ বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সর্বপ্রকার বহিরাগত আগ্রাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে দীনের ছায়ায় জীবনযাপন করতে পারে। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর দাসত্বে জীবন পরিচালনার তাওফিক দান করুন। আমিন।

পরিশিষ্ট : ১

মুখমণ্ডল সতরের অন্তর্ভুক্ত

এই পরিশিষ্টে আমরা শরয়ি পর্দার সীমারেখা ও ইখতিলাত তথা নারী-পুরুষের ফ্রি-মিক্সিং নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে মৌলিক কিছু কথা বলব।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

'মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল নিজ বক্ষদেশে নামিয়ে দেয় এবং নিজেদের ভূষণ যেন স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগিনা,

> আপন নারীগণ, যারা নিজ মালিকানাধীন যৌনকামনা জাগে না এমন খেদমতগার এবং নারীদের গোপনীয় অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া আর কারও সামনে প্রকাশ না করে। মুসলিম নারীদের উচিত ভূমিতে এভাবে পদক্ষেপ না করা, যাতে তাদের গুপ্ত সাজ জানা হয়ে যায়। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো।'[২২৭]

এই আয়াতে 'স্বভাবতই যা প্রকাশিত থাকে তা ব্যতীত' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে মূলত এটাকে কেন্দ্র করেই ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে ইখতিলাফের সৃষ্টি। কিন্তু এই মত-ভিন্নতার প্রকৃতিটা বোঝা আমাদের জন্য জরুরি। এটা সত্য যে, পূর্ববর্তী ইমামদের মাঝে মুখ পর্দার অন্তর্ভুক্ত হওয়া নিয়ে ইখতিলাফ ছিল। কিন্তু তাদের সবার কাছে মুখ ঢাকাই উত্তম হিসেবে বিবেচিত হতো। এমনকি পরবর্তী অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম মুখ ঢাকাকে ওয়াজিব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

এজন্য সালাফদের কিতাবসমূহে মুখ খোলার প্রসঙ্গ নিয়ে বিশেষ কোনো বিতর্ক বা আলোচনা পাওয়া যায় না। এমনকি এককভাবে ছোট কোনো রিসালাও পাওয়া যায় না। পূর্ববর্তী ফিকহের কিতাবে মতবিরোধের দেখা মিললেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানা থেকে আধুনিক ইতিহাসের সূচনা পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর তাওয়ারুসি তথা প্রজন্ম পরম্পরায় আমল ছিল মুখ ঢাকা। এটাই ছিল মুসলিম নারীসমাজের চিত্র। এজন্য অনেকে মুখ ঢাকার ওপর মুসলিম উম্মাহর ইজমায়ে আমালি দাবি করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুমিনদের নীতি ছিল স্বাধীন মহিলারা মুখসহ পুরো শরীর ঢেকে রাখত।'

ইমাম ইবনে আরসালান রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'নারীরা চেহারা খুলে ঘর থেকে বের হবে না—এই ব্যাপারে মুসলিমরা একমত।'[২২৮]

ইমাম আবু হামিদ আল গাজালি রহিমাহুল্লাহ বলেন, সব যুগেই মুসলিম পুরুষরা চেহারা খোলা রাখত আর নারীরা ঢেকে রাখত।[২২৯]

---

২২৭. সুরা নুর, আয়াত ৩১

২২৮. আওনুল মাবুদ, ৪/১০৬ পৃষ্ঠা

২২৯. ইয়াহইয়ায়ু উলুমিদ্দিন, ১/৭৬৯ পৃষ্ঠা

ইমাম আবু হাইয়্যান আল আন্দালুসি রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘স্পেনের মুসলিম নারীদের রীতি ছিল তারা এক চোখ ছাড়া পুরো শরীর ঢেকে রাখতেন।’[২৩০]

ইমাম মাওযিয়ি আশ শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আগে পরে সব যুগে, সব দেশে এটাই ছিল মুসলিমদের আমল। তারা বৃদ্ধাদের মুখ খুলতে দিতেন এবং তরুণীদের মুখ খোলার অনুমতি দিতেন না; বরং এটাকে খারাপ কাজ মনে করতেন।’[২৩১]

সালাফদের কিতাবে এমন অসংখ্য বক্তব্য ও ঘটনা আছে, যা থেকে এটা স্পষ্ট যে, নববি যুগ থেকে আধুনিক ইতিহাস পর্যন্ত মুখ ঢাকার ওপরই মুসলিম নারীদের আমল ছিল। প্রজন্ম পরম্পরায় মুসলিম উম্মাহর এই আমল থেকে স্পষ্ট যে, উম্মাহর ফকিহরা এই মাসআলায় কোন মতের ওপর উম্মাহকে নির্দেশনা দিয়েছেন এবং কোন মতকে তারা সমাজে বাস্তবায়িত রেখেছেন। তারা উম্মতকে সেই মতের ওপরই আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেই মত উম্মাহর পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষা করবে। তবে এই বিষয়টিও স্বীকৃত যে, চার মাযহাবের পরবর্তী ইমামরা আধুনিক যুগে মুখ ঢাকাকে ওয়াজিব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অল্প কিছু আলেম ব্যতিক্রম মত দিয়েছেন।

নববি যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত গাইরে মাহরামদের সামনে মুখ খোলা কখনোই মুসলিম নারীদের সংস্কৃতি ছিল না। মুখ খোলার ব্যাপারে দায়িত্বশীল পুরুষ ও মুখ আবৃতকারী নারীর মাঝে এতটাই আত্মমর্যাদাবোধ ছিল যে, তারা এটার কল্পনাই করতে পারত না। এই ব্যাপারে ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ খুব সুন্দর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ২৮৬ হিজরিতে কাজি মুসা ইবনে ইসহাকের দরবারে একজন নারী তার অভিভাবকসহ একটা মুকাদ্দামা নিয়ে আসল। তিনি মুকাদ্দামা পেশ করতে বললে নারীর পিতা বলল, তার মেয়ে স্বামীর কাছ থেকে মহর বাবদ ৫০০ দিনার পায়। স্বামী তা অস্বীকার করল। এরপর কাজি নারীপক্ষকে বলল, তোমাদের সাক্ষী আছে? মেয়ের অভিভাবক বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী নিয়ে এসেছি। তখন কোনো এক সাক্ষী মেয়েটাকে দেখতে চাইল, যেন সে নিজের সাক্ষীর ব্যাপারে পরিষ্কার হতে পারে। এরপর ওই সাক্ষী মেয়েটাকে দাঁড়াতে বলল। তখন তার স্বামী দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, তোমরা এসব কী করছ? তখন উকিল বলল, তারা তোমার স্ত্রীকে মুখ খোলা অবস্থায় দেখতে চায়,

---

২৩০. আল বাহরুল মুহিত, ৩/১৪৪ পৃষ্ঠা

২৩১. তাইসিরুল বয়ান লি আহকামিল কুরআন, ২/১০০১ পৃষ্ঠা

যেন তারা তাকে চিনতে পারে। স্বামী বলল, আমি কাজি সাহেবকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমার স্ত্রী যেই মহর আমার ওপর দাবি করেছে, সে আমার থেকে তা প্রাপ্য। তার চেহারা খোলার কোনো প্রয়োজন নেই। স্বামীর এই গায়রতপূর্ণ আচরণ দেখে স্ত্রী বলে উঠল, আমিও কাজি সাহেবকে সাক্ষী রেখে বলছি, এই মহর আমি তাকে হাদিয়া দিয়ে দিলাম এবং দুনিয়া ও আখেরাতে এর দায় থেকে তাকে মুক্ত করে দিলাম।[২৩২]

মূলত প্রজন্ম পরম্পরায় সতরের প্রতি এটাই ছিল মুসলিম উম্মাহর গাইরাত। মুখ খোলার প্রশ্ন কিংবা মুসলিম নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন ও ফ্রি-মিক্সিংয়ের যেই সংস্কৃতি, এটা শুরুই হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম দেশগুলোতে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে। মুসলিম দেশগুলোতে উপনিবেশ আমলের শুরু পর্যায়ের প্রামাণ্যচিত্রগুলোও আমরা যদি ঘেটে দেখি, তখন আমাদের সামনে বিভিন্ন দেশের মুসলিম নারীদের আপাদমস্তক আবৃত চিত্রই নজরে আসবে। রাস্তাঘাট, বাজার সর্বত্র মুসলিম নারীদের আমরা এই পোশাকেই দেখতে পাব।[২৩৩]

আমরা যদি মাকাসিদে শরিয়াহর আলোকে মুখ খোলা রাখা প্রসঙ্গটির দিকে দৃষ্টি দিই, তাহলে দেখব বর্তমানে মুখ খোলা রাখা নিশ্চিতভাবে মাকাসিদে শরিয়ায় উত্তীর্ণ হয় না। ইসলামি শরিয়ায় পর্দার বিধানের উদ্দেশ্য হলো, নারীর সৌন্দর্যকে গাইরে মাহরাম পুরুষ থেকে আবৃত রাখা। যেন নারীর প্রতি পুরুষের স্বভাবজাত যেই আকর্ষণ সেটা নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং কোনো অঘটন না ঘটে। আর একজন নারীকে পছন্দ হওয়া কিংবা তার প্রতি প্রাথমিক আকর্ষণ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে তার চেহারার দর্শনই প্রধান ভূমিকা রাখে। চেহারা ঢেকে রাখাই মাকাসিদে শরিয়াহর দাবি।

এখানে আরেকটা বিষয় হলো, আমরা যারা ইখতিলাফের দোহাই দিয়ে চেহারা খুলে রাখার সুবিধা গ্রহণ করতে চাই, তাদের অধিকাংশই আসলে এই মতটা এই

---

২৩২. আল মুন্তাজাম, পৃষ্ঠা ১২/৪০২, আল্লামা ইবনে কাসির আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতেও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

২৩৩. এই লিংকে একটি ভিডিও আছে। ভিডিওটিতে উপনিবেশ আমলের আগে মুসলিম দেশগুলোতে নারীদের পোষাকের প্রামাণ্যচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। https://www.facebook.com/106539387618516/posts/369454631326989/

জন্য গ্রহণ করছেন না যে, মতটা শরিয়াহর সার্বিক দলিলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত; বরং নিজের অবস্থান কিংবা প্রবৃত্তিকে বহাল রাখার জন্য এই সুবিধাটা গ্রহণ করা হচ্ছে। আবার যারা মুখ খোলা রাখার মত বর্ণনা করেন, তাদের অনেকেই অত্যন্ত সাধারণভাবে বিষয়টাকে উপস্থাপন করেন। খোলা রাখার মত গ্রহণ করলেও যে এখানে অনেক শর্ত ও নীতিমালা আছে, সেটা তাদের বক্তব্যে উঠে আসে না। যেমন, চুল ও কান সতরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। কিন্তু অনেক নারী মুখ খোলা রাখতে গিয়ে মাথার উপরিভাগের চুলকেও প্রকাশ করেন, আবার কানকেও খোলা রাখেন। যা সবার ঐকমত্যে হারাম। আবার যেই মতে মুখমণ্ডলকে স্বভাবতই প্রকাশিত থাকা হিসেবে মুখ খোলা রাখা বৈধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানেও যদি কোনো প্রকার কৃত্রিম সৌন্দর্য, মেকাপ বা অন্য যেকোনো প্রকার সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়, তাহলে তা প্রকাশ করা হারাম হয়ে যাবে। কারণ তাদের মতে তখন সেটা আর স্বাভাবিক সৌন্দর্য থাকবে না। এজন্য তাদের মতে অনুমোদিত অংশগুলোও কোনো প্রকার সাজসজ্জা ছাড়া প্রকাশ করতে হবে।[২৩৪]

বর্তমানে যারা মাথা ঢেকে মুখ খুলে বের হয়, তাদের কেউই সৌন্দর্যবর্ধনকারী জিনিস ব্যবহার করা ছাড়া বের হয় বলে মনে হয় না। যদিও এরকম কাউকে পাওয়া যায়, তবে সেটা একদমই বিরল ঘটনা। সুতরাং জমহুর উলামায়ে কেরামের মতই নিরাপদ ও বাস্তবতার আলোকে উত্তীর্ণ। কিছু আলেমদের যেই মত, সেই মত অনুযায়ীও মুখ খোলা রাখা অবস্থায় সতরের শরয়ি বিধান পালিত হচ্ছে না।

এখানে আমরা উভয় পক্ষের দলিলসমূহ এনে পর্যালোচনা করে আলোচনা দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না। এর উপযুক্ত স্থানও এটি নয়। তবে আমরা সংশ্লিষ্ট মাসআলায় উত্তম সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য মৌলিক কিছু বিষয় তুলে ধরলাম। নিষ্ঠার সাথে আমরা যদি বিবেচনা করি, তাহলে আমাদের সামনে মুখ ঢাকার মতটিকেই বিশুদ্ধ ও উম্মাহর জন্য কল্যাণকর মনে হবে। মাকাসিদে শরিয়াহ, উম্মাহর সুদীর্ঘকালের আমল ও বর্তমান সমাজের অবস্থা সর্বদিক বিবেচনায় মুখ ঢাকাই ইসলামি শরিয়াহর প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত এবং উসুলে ফিকহের দৃষ্টিতে মুখ ঢাকা

২৩৪. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা, ২৬৮ পৃষ্ঠা। আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন, পৃষ্ঠা ১২৫; আমালুল মারআতি ওয়া ইখতিলাতুহা, পৃষ্ঠা ৭৫

ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত। বৃদ্ধ নারী, যাদের দেখে আকর্ষিত হওয়ার সুযোগ নেই, তাদের জন্য কিংবা একান্ত প্রয়োজনের সময় মুখ খোলা রাখার মতের ওপর আমল করা যেতে পারে।[২৩৫]

বর্তমানে মডার্নিস্ট কিছু মুসলিমের পক্ষ থেকে একটি অবান্তর দাবি করা হয়। সেটা হলো, নিকাব বা হিজাবের বিধান কেবল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের জন্য বিশেষ বিধান। বাকি মুসলিম মেয়েরা এই বিধানের আওতাভুক্ত নয়। মূলত এই ধরনের আপত্তি সাহাবাদের যুগ থেকে নিয়ে উপনিবেশ আমলের আগ পর্যন্ত মুসলিম-সমাজে প্রচলিত ছিল না। উপনিবেশের আমলে পশ্চিমা সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু মুসলিম মুসলিম-সমাজের ভেতর এই আপত্তি ছড়ানোর চেষ্টা করেছে। এর মধ্যে কাসিম আমিনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, বইয়ের ভূমিকাতে যার আলোচনা আমরা করে এসেছি। কাসিম আমিন তার লিখিত তাহরিরুল মারআহ গ্রন্থে এই দাবি করে মুসলিম নারীদের পশ্চিমা নারীদের মতো সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

তখনকার সময়ের বিখ্যাত আলেমে দীন, উসমানি খিলাফার একজন বিচারক শাইখুল ইসলাম মুস্তফা আস সবারি তার বিশ্ববিখ্যাত কিতাব মাওকিফুল আকলি ওয়াল ইলমি ওয়াল আলামি এর ভেতর কাসিম আমিনের এই দাবির খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন, ‘কাসিম আমিন তার বইয়ে মুসলিম নারীদের হিজাব ও পুরুষদের থেকে তাদের দূরে থাকার যে বিধান, তার ওপর নগ্ন আক্রমণ চালিয়েছে। সে পশ্চিমা নারীদের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শনের পক্ষে প্রতিরোধকারী হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেছে।’

তার মতে মুসলিম-সমাজে প্রচলিত যে হিজাব, সেটা উম্মাহাতুল মুমিনিনের সাথেই খাস। তার এই দাবির পক্ষে সে সুরা আহযাবের ৩২ এবং ৫৩ নং আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করে। তার যুক্তি হলো, এই আয়াতে যে সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে, তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে। এজন্য আয়াতে উল্লিখিত বিধিনিষেধ বিশেষভাবে তাদের জন্যই আরোপ হবে, অন্য কোনো মহিলার জন্য নয়।

---

২৩৫. একান্ত বাধ্যগত অবস্থা কী কী, এই বিষয়টি প্রায়োগিকভাবে বিশ্বস্ত কোনো আলেম থেকে জেনে নেওয়াই নিরাপদ।

আমরা বলব, সুরা আহযাবের ৩২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'হে নবীপত্নীরা, তোমরা অন্যান্য মহিলাদের মতো নও।' এখানে উনাদের বিশেষত্ব আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে নয়; বরং এই বিশেষত্বের সম্পর্ক তাদের পূণ্য ও পাপের বদলার সাথে। যা মহান আল্লাহ তাআলা সুরা আহযাবের ৩০ এবং ৩১ নং আয়াতে বলেছেন। ৩২ নং আয়াতের পর যেসব বিধিনিষেধ এসেছে, এর সাথে ৩২ নং আয়াতের প্রথম অংশের কোনো বিশেষত্ব নেই। আর সেই বিধিনিষেধগুলো হলো—

> 'হে নবী পত্নীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও, যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো। সুতরাং তোমরা কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, পাছে অন্তরে ব্যাধি আছে এমন ব্যক্তি লালয়িত হয়ে পড়ে। আর তোমরা বলো ন্যায়সঙ্গত কথা।
>
> নিজ গৃহে অবস্থান করো, (পর-পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না, যেমন প্রাচীন জাহেলী যুগে প্রদর্শন করা হতো। নামাজ কায়েম করো, জাকাত আদায় করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো। হে নবী পরিবার (আহলে বাইত)! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে মলিনতা দূরে রাখতে এবং তোমাদেরকে এমন পবিত্রতা দান করতে, যা সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ হবে।'[২৩৬]

যদি এই আয়াতের বিধানগুলো উম্মাহাতুল মুমিনিনের সাথে খাস হয়, তাহলে কি মুসলিম নারীদের পুরুষদের আকর্ষণ করার জন্য নম্র স্বরে কথা বলা, সৎ কথা না বলা, ঘরে অবস্থান না করা, জাহিলিয়াতের মতো নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করা, সালাত না পড়া, জাকাত না দেওয়া, এমনকি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য না করা—এ সবকিছু বৈধ হয়ে যাবে?

তারপর ৫৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

> وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.
>
> 'নবীর স্ত্রীগণের কাছে তোমাদের কিছু চাওয়ার থাকলে পর্দার আড়াল

---

২৩৬. সুরা আহযাব, আয়াত ৩২-৩৩

থেকে চাবে। এ পন্থা তোমাদের অন্তর ও তাদের অন্তর অধিকতর পবিত্র রাখার পক্ষে সহায়ক হবে।'

রাসুলের স্ত্রী, যারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ নারী এবং রাসুলের সাথিবর্গ, যারা উম্মাহর শ্রেষ্ঠ অংশ হওয়া সত্ত্বেও অন্তরের পবিত্রতা কি কেবল তাদেরই প্রয়োজন, আর বাকি মুসলিম নারী-পুরুষের অন্তরের পবিত্রতার প্রয়োজন নেই?

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, সুরা আহযাবে হিজাবের যেই বিধান, সেটা উম্মাহাতুল মুমিনিনের জন্য বিশেষ বিধান নয়; বরং সমস্ত মুসলিম নারীদের জন্যই এই বিধান প্রযোজ্য। কিন্তু কাসিম আমিন নিজের প্রবৃত্তিকে প্রচারের জন্য আকল ও বুঝ-শক্তির ভুল ব্যবহার করেছে এবং আল্লাহর কালামে বিকৃতি সাধন করেছে।

সুরা আহযাবেই আরেকটি আয়াত আছে, যেটি কাসিম আমিনের দাবিকে খণ্ডন করে দেয়। সেই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিজাব সকল মুসলিম নারীর জন্য আবশ্যক। নবীপত্নী ও অন্যান্য নারীর মাঝে এই বিধান প্রযোজ্য হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের, তোমার কন্যাদের ও মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের (মুখের) ওপর নামিয়ে দেয়। এ পন্থায় তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[২৩৭]

এর থেকে সুস্পষ্ট বিধান আর কী হতে পারে! 'জালাবিব' শব্দটি 'জিলবাব' এর বহুবচন। আর 'জিলবাব' ওই চাদরকে বলে, যার ভেতর নারীর পুরো শরীর আবৃত থাকে। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা কেবল জিলবাবের কথা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি; বরং সেই চাদরকে মাথার ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিতে বলেছেন। যেন চেহারাও চাদরে আবৃত হয়ে যায়।[২৩৮]

---

২৩৭. সুরা আহযাব, আয়াত ৫৯

২৩৮. মাওকিফুল আকলি, ওয়াল ইলমি ওয়াল আলামি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১১-৪১২; ইসলামি

ফ্রি-মিক্সিং

ফ্রি-মিক্সিং নিয়ে এখানে আমরা বিস্তারিত আলাপ করব না। আমরা কেবল এখানে সংক্ষিপ্তভাবে ফ্রি-মিক্সিং হারাম হওয়ার কিছু দলিল ও মডার্নিস্ট মুসলিমদের সংশয়ের জবাব তুলে ধরার চেষ্টা করব। তার আগে একটা বিষয় পরিষ্কার করে নিচ্ছি।

আমরা অনেক সময় সতর আবৃত করার বিধানের সাথে আরও বেশ কিছু বিধানকে মিলিয়ে ফেলি । আর মিলিয়ে ফেলার এই ভাব থেকেই আমাদের মাঝে একটি ভয়াবহ চিন্তার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। সেটা হলো, সতর আবৃত করে সব করা যায়। কিন্তু আমরা ভুলে যাই সতর আবৃত করা পরিপূর্ণ পর্দা নয়। পর্দার বিধানের সাথে আরও অনেক বিধান জড়িত আছে। পুরো শরীর ও হাত-মুখ ঢাকা পৃথক একটি বিধান। ফ্রি-মিক্সিং, গাইরে মাহরাম পুরুষের সাথে নির্জনতা অবলম্বন, গান-বাদ্য, মডেলিং ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা পৃথক বিধান। এজন্য যথারীতি সতর আবৃত করেও কোনো নারী গাইরে মাহরাম পুরুষের সাথে নির্জনতায় অবস্থান করতে পারবে না।[২৩৯] কারণ সতর আবৃত করা ও নির্জনতা অবলম্বন না করা, দুটো পৃথক পৃথক বিধান। একটির জন্য অপরটি শিথিল হয়ে যাবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে তার কোনো মাহরাম না থাকা অবস্থায় নির্জনতা অবলম্বন না করে।[২৪০] অন্য হাদিসে আছে, কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান করলে সেখানে শয়তান থাকে তৃতীয় পক্ষ (অর্থাৎ শয়তান তখন তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়)।[২৪১]

এমনিভাবে যথারীতি সতর আবৃত করেও কোনো নারী গাইরে মাহরাম পুরুষদের সাথে কোনো অনুষ্ঠান, সম্মেলন, কর্মক্ষেত্র কিংবা শ্রেণিকক্ষ ইত্যাদিতে পুরুষদের সাথে ইখতিলাত তথা ফ্রি-মিক্সিং করতে পারবে না।[২৪২] এটা তার জন্য বৈধ নয়; বরং এসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের জন্য পৃথক ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে। মোটকথা,

---

মুহ্বাত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৭-১৭০

২৩৯. আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন, পৃষ্ঠা ১২৫

২৪০. সহিহ বুখারি, হাদিস ২৮৪৪

২৪১. জামে তিরমিযি, হাদিস ২১৬৫

২৪২. আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন, পৃষ্ঠা ১২৫

সতর আবৃত করেও সব করা যায় না। সতর আবৃত করার কারণে শরিয়তের অন্যান্য বিধানে শিথিলতা আসে না। সতর আবৃত করা পৃথক একটি বিধান, শালীনতাবিরোধী ও ফাহেশা কাজ না করা আরেকটি বিধান। এজন্য হিজাব পরে সব করা যায় এই মানসিকতা আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে।

ইখতিলাত বা ফ্রি-মিক্সিং বলা হয়, গাইরে মাহরাম নারী-পুরুষ শিক্ষাক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র, আড্ডা, সম্মেলন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোনো ব্যবধান কিংবা আড়াল ছাড়া একই স্থানে একত্রিত হওয়া। যেই পরিবেশ থেকে তারা খুব সহজেই মেলামেশা, কথাবার্তা, আকার-ইঙ্গিত করতে পারে।

ইসলাম সাধারণভাবে ফ্রি-মিক্সিং হারাম করেছে। একান্ত বাধ্যগত পরিস্থিতি ছাড়া গাইরে মাহরাম নারী-পুরুষের জন্য ফ্রি-মিক্সিং বৈধ নয়। ইখতিলাত হারাম হওয়ার বিস্তারিত দলিল পেশ করা এখানে সম্ভব না। এর জন্য পৃথক রচনার প্রয়োজন। আমি এখানে ইখতিলাত হারাম হওয়ার পক্ষে এমন কিছু দলিল পেশ করতে চাচ্ছি, যেগুলো ব্যবহার করে মডার্নিস্টরা স্বয়ং ইখতিলাতকেই বৈধ প্রমাণ করতে চায়। এতে একদিকে ইখতিলাত হারাম হওয়ার দলিলও প্রদান হয়ে যাবে, অন্যদিকে মডার্নিস্টদের খণ্ডনও হয়ে যাবে।

মুসা আলাইহিস সালাম মাদায়েনের দুইজন নারীকে পানি উত্তোলন করে দিয়েছিলেন। সেই ঘটনা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ.

‘যখন সে মাদইয়ানের কুয়ার কাছে পৌঁছল, সেখানে একদল মানুষকে দেখল, যারা তাদের পশুদের পানি পান করাচ্ছে। আরও দেখল তাদের পেছনে দুজন নারী, যারা তাদের পশুগুলোকে আগলিয়ে রাখছে। মুসা তাদের বলল, তোমরা কী চাও? তারা বলল, আমরা আমাদের পশুগুলোকে ততক্ষণ পর্যন্ত পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না সমস্ত রাখাল তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে চলে যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ। তখন মুসা তাদের পশুগুলোকে পানি পান

করিয়েছিলেন। তারপর একটি ছায়াস্থলে ফিরে আসলেন। তারপর বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণ বর্ষণ করবে আমি তার ভিখারী।'[২৪৩]

এই আয়াত ফ্রি-মিক্সিং নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে সুস্পষ্ট একটি দলিল। আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দুই মেয়ে পুরুষদের ভিড় থেকে দূরে দাড়িয়েছিলেন এবং তাদের চলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। যেন তারা মিক্সিং ছাড়া পানি তুলে আনতে পারেন। ইবনে জারির রহিমাহুল্লাহ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করে বলেন,

'আমরা দুজন নারী, আমরা পুরুষদের সাথে ভিড় জমাতে পারি না।'[২৪৪]

ইমাম বাগাভি রহিমাহুল্লাহ বলেন, বাকিরা শেষ না করা পর্যন্ত আমরা পালিত পশুদের পানি পান করাতে পারি না। কারণ আমরা দুইজন মেয়ে। এই ধরনের ভিড়ের পরিবেশে আমরা আমাদের পশুদের পানি পান করাতে পারি না এবং আমাদের পক্ষে পুরুষদের সাথে মিলিত হওয়াও সম্ভব নয়।[২৪৫]

সুতরাং এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, নারীদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে পুরুষদের সাথে ইখতিলাত না করা। এই আয়াত থেকে আরেকটি বিষয় বোঝা যায়, সাধারণত ঘরের বাইরে নারীদের জন্য কাজ করা উচিত নয়; বরং ঘরের পুরুষরা এসব কাজ সম্পাদন করবে। একমাত্র অপারগতা কিংবা প্রয়োজনের সময় নারীরা ঘরের বাইরে শরিয়াতের অন্যান্য বিধিমালা মেনে কাজ করতে পারে। এজন্য হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দুই মেয়েকে তাদের দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করল, তারা দুটি কারণ দেখাল। একটি হলো, আমরা পুরুষদের সংস্পর্শে যাব না। এজন্য তাদের প্রস্থানের অপেক্ষায় আছি। অপর কারণটি হলো, আমাদের কোনো ভাই নেই এবং আমাদের বাবাও বৃদ্ধ মানুষ; কাজ করতে অক্ষম। এজন্য আমরা গবাদিপশুকে পানি পান করাতে এসেছি। অর্থাৎ অপারগ হয়ে এসেছিলেন এবং যেহেতু আসতেই হয়েছে, এজন্য বাইরের পরিবেশের আদব রক্ষার্থে ফ্রি-মিক্সিং এড়িয়ে চলছেন।

---

২৪৩. সুরা কাসাস, আয়াত ২৩-২৪

২৪৪. জামিউল বায়ান ফি তাওইলিল কুরআন

২৪৫. মাআলিমুত তানযিল

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, এই আয়াতে ফ্রি-মিক্সিংয়ের বিরুদ্ধে এত সুস্পষ্ট বার্তা থাকার পরেও কিছু বিভ্রান্ত ব্যক্তি এই আয়াতকে ফ্রি-মিক্সিংয়ের পক্ষে দলিল হিসেবে ব্যবহার করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। যেমন বিখ্যাত মডার্নিস্ট আব্দুল হালিম আবু শুক্কাহ তার লিখিত গ্রন্থ তাহরিরুল মারআহ ফি আসরির রিসালাহ-এর ভেতর ফ্রি-মিক্সিংয়ের পক্ষে এই আয়াতটিকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছে।[২৪৬] অথচ সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে উম্মাহর সকল মুফাসসির ও ফকিহরা এই আয়াতকে ঠিক সেভাবেই বুঝেছেন, যেমনটা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মডার্নিস্টরা সালাফদের সকলের বুঝকে প্রত্যাখ্যান করে যুগের সাথে তাল মেলানোর নামে মনগড়া নিজস্ব ভ্রান্ত বুঝের আশ্রয় নেয়। ইসলামকে কথিত সংস্কারের নামে তাদের মূল ভূমিকাই হলো, সালাফে সালেহিনের আমল ও বুঝকে পেছনে ছুঁড়ে ফেলা।

ফ্রি-মিক্সিংয়ের বিপক্ষে আরেকটি দলিল হলো, নারীদের তালীম বা শিক্ষার জন্য আলাদা স্থান ও দিন নির্ধারণ করে দেওয়ার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস। আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন নারী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমাদের থেকে পুরুষরাই আপনার কাছে অধিকাংশ সময় থাকে। আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য আলাদা দিন নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের তালীম দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।[২৪৭]

আল্লামা আইনি রহিমাহুল্লাহ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ পুরুষরাই প্রতিদিন আপনার পাশে থাকে এবং ইলম ও দীনি বিষয় শ্রবণ করে। আমরা

---

২৪৬. দুঃখজনক বিষয় হলো, বিখ্যাত দুজন ব্যক্তি বইটির শুরুতে প্রশংসাসুলভ অভিমত লিখে দিয়েছেন। একজন হলেন শায়খ মুহাম্মাদ আল গাজ্জালি, অন্যজন হলেন শায়খ ইউসুফ আল কারজাভি। শায়খ ইউসুফ আল কারজাভিও তার বিভিন্ন লেখায় ফ্রি-মিক্সিংকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেছেন এবং এটাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত ইসলামি সভ্যতার একটি স্বাভাবিক সংস্কৃতি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। মূলত মুসলিমদের ভেতর আধুনিক সংস্কারবাদী যেই ধারাটি রয়েছে তাদের সকলের ভেতরই কমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলাপের সুযোগ নেই। আমরা ভিন্ন কোনো গ্রন্থে তাদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইরাদা রাখি। ইনশাআল্লাহ।

২৪৭. সহিহ বুখারি, হাদিস ১০১

নারীরা দুর্বল, তাদের ভিড়ে আমরা আসতে পারি না। আমাদের জন্য বিশেষ একটি দিন ধার্য করে দিন। যেদিন আমরা আপনার কাছ থেকে ইলম ও দীনি বিষয় শুনব।[২৪৮]

আরেক হাদিসে এসেছে, একজন নারী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, 'পুরুষরা আপনার হাদিস আহরণ করে নিয়ে যায়। আমাদের জন্য নির্দিষ্টভাবে আলাদা স্থান ও সময় নির্ধারণ করে দিন, যেদিন আমরা আপনার কাছে শিক্ষার জন্য আসব। আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়েছেন, আপনি আমাদের তা শেখাবেন।' তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'অমুক দিন অমুক স্থানে তোমরা একত্রিত হবে। এরপর থেকে নারীরা নির্ধারিত সময় ওই জায়গাতে একত্রিত হতো এবং তিনি তাদের আল্লাহ যা শিখিয়েছেন তার শিক্ষা দিতেন।'[২৪৯]

উপরে উল্লেখিত দুটি হাদিস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসুলের যুগে নারী সাহাবিরাও পুরুষদের সাথে সাধারণ মেলামেশা থেকে দূরে থাকতেন। অথচ তারা ছিলেন এই উম্মতের মাঝে সবচেয়ে পবিত্র হৃদয় ও পরিচ্ছন্ন ঈমানের অধিকারী। যদি ফ্রি-মিক্সিং অনুমোদিতই হতো, তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের পুরুষদের সাথেই আসতে বলতেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে শিক্ষা, মসজিদ, রণক্ষেত্র কোথাও ফ্রি-মিক্সিং ছিল না। যেমনটা মডার্নিস্ট মুসলিমরা দাবি করে। মসজিদে নামাজের সময়ও নারীরা পুরুষদের থেকে আলাদা থাকতেন। এমনকি হাদিসে এমন বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, নারীরা অন্য কোনো পুরুষকে পাঠিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রশ্ন পৌঁছাতেন। স্বয়ং নারীরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করার যেসব বর্ণনা আছে, সেগুলো থেকেও ফ্রি-মিক্সিং সাব্যস্ত হয় না। কারণ তারা পুরুষদের থেকে আলাদা জায়গায় অবস্থান করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করতেন।

রাসুলের যুগে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নারীরা যুদ্ধের ময়দানে অংশগ্রহণ করত না। কারণ সাধারণত ময়দানের যুদ্ধ নারীদের ওপর আবশ্যক নয়। এজন্যই হযরত

২৪৮. উমদাতুল কারি, ২/২৩৪ পৃষ্ঠা
২৪৯. সহিহ মুসলিম, হাদিস ৬৬৯৯

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিহাদের সওয়াবের তামান্না প্রকাশ করলে তিনি তাকে বলেন, কবুল হজই হলো তোমাদের জিহাদ।[২৫০]

তবে প্রয়োজনের স্বার্থে বেশ কিছু যুদ্ধে নারীরা অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু সেই অংশগ্রহণ লড়াইয়ের জন্য ছিল না। ছিল আহতদের স্বাস্থ্য সেবা ও খাবার-পানীয় সরবরাহের জন্য। এই বিষয়টিকেও মডার্নিস্টরা ফ্রি-মিক্সিং বৈধ হওয়ার জন্য দলিল হিসেবে পেশ করে। অথচ এই ঘটনা থেকেও ফ্রি-মিক্সিং প্রমাণিত হয় না। কারণ তারা পুরুষদের থেকে পৃথক হয়ে কাফেলার সঙ্গী হতো। যেমনটা সহিহ মুসলিমের এক হাদিসে এসেছে—উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাতটি যুদ্ধে ছিলাম। সেগুলোতে আমি কাফেলার পেছনের থাকতাম। আর তাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং অসুস্থদের দেখাশোনা করতাম।'[২৫১]

ইমাম কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ আরও পরিষ্কার করে বলেছেন। যেসব নারীরা যুদ্ধে অংশ্রহণ করত, তারা সেনাদের পানি সরবরাহ করার ক্ষেত্রে পানির পাত্র পুরুষদের নিকটতম স্থানে রেখে দিয়ে আসত। আর পুরুষরা সেটা নিজেরা পান করে নিত। এমনিভাবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তারা ক্ষতস্থানের জন্য ওষুধ প্রস্তুত করত । কিন্তু পুরুষদের অবৈধভাবে স্পর্শ করত না। আর তাদের মধ্যে বয়স্ক নারীদের জন্য মুখ খোলা রাখার বৈধতা ছিল। আর যুবতীরা মুখ ঢেকে রাখত।[২৫২]

এই প্রসঙ্গে ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ বলেন, নারীরা সাধারণত তাদের মাহরাম পুরুষ ও স্বামীদের চিকিৎসা করত। আর গাইরে মাহরাম পুরুষদের ক্ষেত্রে চিকিৎসার প্রয়োজন হলে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া স্পর্শ পর্যন্ত করতেন না।[২৫৩]

সবচেয়ে বড় কথা হলো, যুদ্ধের মতো প্রয়োজনের পরিস্থিতির সাথে তুলনা করে স্বাভাবিক কোনো জিনিসের বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। সালাফদের কেউই এসব বর্ণনা থেকে ইখতিলাতের বৈধতার কথা বলেননি। তারা নির্দিষ্ট কোনো

---

২৫০. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস ২৪৪২২
২৫১. সহিহ মুসলিম, হাদিস ৪৬৯০
২৫২. আল মুফহিম লিমা উশকিলা মিন তালখিসি মুসলিম, ৩/৫৪২ পৃষ্ঠা
২৫৩. শরহে নববি লিল মুসলিম, ৬/৪২৯ পৃষ্ঠা

ঘটনাকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে দেখিয়ে ইখতিলাতকে ব্যাপকভাবে বৈধতা দেননি এবং উৎসাহও প্রদান করেননি; বরং কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। ফ্রি-মিক্সিংকে বৈধ করার জন্য মডার্নিস্টরা যেসব দলিল দেখাতে প্রচেষ্টা করে, তার সবগুলো দলিল এখানে খণ্ডন করা সম্ভব না এবং এটার প্রয়োজনও নেই। আমরা যদি তাদের এই সমস্ত দলিল উপস্থাপনের পেছনের মৌলিক সমস্যাটা চিহ্নিত করতে পারি, তবেই তাদের দলিলগুলোর অসারতা বুঝতে পারব। আর সেই মৌলিক সমস্যাটা হলো, কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন ঘটনাকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থাপন করা এবং যুগ চাহিদা কিংবা ইজতিহাদ, তাজদিদ, মাকাসিদ, মাসালিহ ইত্যাদির নামে সালাফে সালেহিনের বুঝকে অগ্রাহ্য করে প্রবৃত্তি কিংবা পশ্চিমা সভ্যতার আদলে মনগড়া ব্যাখ্যা পেশ করা। এটাই তাদের মূল সমস্যা। কিন্তু এই কথা সব যুগের সব আলেমদের কাছে ঐকমত্যে স্বীকৃত যে, সালাফদের বুঝ ও আমলের বাইরে গিয়ে ইসলামকে বোঝা সম্ভব না। যারাই এই কাজ করতে গিয়েছে তারাই ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে নিয়ে ফ্রান্স ও ব্রিটিশদের উপনিবেশের আগে মুসলিম-সমাজে ফ্রি-মিক্সিংয়ের সংস্কৃতি ছিল না। প্রথমে উপনিবেশবাদীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে ফ্রি-মিক্সিংয়ের প্রচলন শুরু করে। আর সেটাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য পশ্চিমা সভ্যতায় প্রভাবিত একদল কথিত বুদ্ধিজীবি কুরআন-সুন্নাহকে বিকৃত করে। এর আগ পর্যন্ত ফুকাহায়ে কেরামের কোনো কিতাবে ইখতিলাত হারাম হওয়ার ব্যাপারে ন্যূনতম বিতর্ক দেখা যায় না। উপনিবেশের সাথে সাথে মুসলিম দেশগুলোতে এই বিতর্ক প্রবেশ করেছে কাসিম আমিনের মতো কিছু লোকের হাত ধরে। যারা ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় সাদা চামড়ার লোকদের সেবা করে গেছে এবং আজও কিছু মুসলিম বুঝে কিংবা না বুঝে নিষ্ঠার সাথে এই সেবা পালন করে যাচ্ছে। আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে এদের ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ রাখুন এবং তাদেরও সঠিক বোধ ও বুঝ দান করুন। আমিন।

পরিশিষ্ট : ২

এই পরিশিষ্টে আমরা নারীর শিক্ষা, চাকরি ও রাজনৈতিক তৎপরতা নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু কথা বলব। ফিকহি ইখতিলাফ ও তার পক্ষে বিপক্ষের দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে আলোচনা করব না। এখানে আমরা ফিকহি আলোচনার বাইরে গিয়ে এগুলোর প্রতি ইসলামের মৌলিক চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গি জানার চেষ্টা করব।

নারী-শিক্ষা

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে শিক্ষা অর্জনের নির্দেশ দেয় এবং উৎসাহ প্রদান করে। কুরআন-হাদিসে এমন কোনো উক্তি নেই যা নারীর শিক্ষা গ্রহণকে নিষিদ্ধ করে কিংবা নিরুৎসাহিত করে। ইসলামের ইতিহাসে অনেক আলিমা, মুহাদ্দিসা, ফকিহা ও খ্যাতনামা নারীদের দৃষ্টান্ত আছে। যেই সাতজন মহান ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের প্রজ্ঞা গণমানুষের কাছে পৌঁছেছে, তাদের একজন হলেন উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা। এমনকি ইসলামি ইতিহাসে নারীরা ফতোয়া প্রদানের খেদমতও আঞ্জাম দিয়েছেন।

ইসলামে নারীর শিক্ষা কোনো গৌণ বিষয় নয়; বরং এটি একটি আবশ্যকীয় বিষয়। এজন্য কেউ নারীর শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করতে পারে না। এমনকি কোনো নারী যদি উচ্চশিক্ষাও অর্জন করতে চায়, তবে তাকে বাধা দেওয়া বৈধ হবে না।

তবে সেই শিক্ষা, তার পরিবেশ ও উদ্দেশ্য অবশ্যই নারীর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্বের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া যাবে না। ইসলামি শরিয়াহর নীতিমালা ও চাহিদার পরিপন্থি হওয়া যাবে না। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি এটাই যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কাউকেই এই শিক্ষা তাদের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন করে না। তাদের আদর্শ পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা এখানে নেই।

বিশেষ করে সমাজে নারীশিক্ষার যেই আস্ফালন, তার পুরো প্রজেক্টই পশ্চিমাবান্ধব। এই শিক্ষা প্রজেক্টের অন্যতম এজেন্ডা হলো, নারীকে কেবল একজন উৎপাদক যন্ত্র হিসেবে আমদানি করা। প্রচলিত নারীশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, নারীকে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত করা, নারীকে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান হওয়ার এক অপ্রাকৃতিক ও ঘৃণ্য প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেওয়া।

উপনিবেশ আমলে যখন মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন শায়খ মুস্তফা আস সবারি রহিমাহুল্লাহ কওলি ফিল মারআহ ওয়া মুকারানাতুহু বি আকওয়ালি মুকাল্লিদাতিল গারবি নামক গ্রন্থ লেখেন। এই বইয়ে তিনি বলেন, আমি মনে করি নারীদের শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত তাদের প্রধান ও স্বভাবজাত দায়িত্ব পালন। অর্থাৎ পরিবার পরিচালনা, সন্তান প্রতিপালন ও তাদের চরিত্র গঠন। এবং তাদের শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত পারিবারিক ব্যবস্থাপনা, সুস্থতা ও অর্থনীতির ওপর। সব কাজে ও সর্বক্ষেত্রে পুরুষদের সমান হওয়ার জন্য তাদের শিক্ষা কর্মসূচি হওয়া উচিত নয়। কারণ এটা সম্ভবও না, কল্যাণকরও না। আর নারী-পুরুষের সমতার যেই দাবি, এটা কখনোই সম্ভব নয়। একজন পুরুষের জন্য যেসব বিষয় উপযুক্ত, তার সবগুলো একজন নারীর জন্য উপযুক্ত হবে না।[২২৪] একই কথা বিপরীত ক্ষেত্রেও।

এজন্য নারী-পুরুষের শিক্ষা কর্মসূচি এক হওয়া মারাত্মক ক্ষতিকর। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো, সমাজের সদস্যদের স্ব স্ব দায়িত্বে দায়িত্ববান করে তোলা। দীনের বুনিয়াদি শিক্ষার পর স্ত্রী ও মা হিসেবে একজন নারীর শিক্ষায় প্রথম অগ্রাধিকার পাবে এই সংক্রান্ত শিক্ষা অর্জন করা। এজন্য শায়খ মুস্তফা আস সিবায়ি রহিমাহুল্লাহ মনে করতেন, বিশেষভাবে পরিবার পরিচালনা-সংক্রান্ত

২২৪. কওলি ফিল মারআহ, পৃষ্ঠা ৮১

বিদ্যা মেয়েদের পাঠ্যসূচিতে বেশি পরিমাণ থাকা উচিত। যাতে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে সফলতা অর্জন সহজ হয়।[২৫৫]

পাশাপাশি মেধা অনুপাতে এবং দীন, উম্মাহ ও সমাজের প্রয়োজনে তার ফিতরাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন শাস্ত্রেও একজন নারী ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারে। নারীর শিক্ষা কর্মসূচি এমন হতে হবে, যা তাকে আদর্শ স্ত্রী ও মা হিসেবে গড়ে তুলবে। তাকে পুরুষের সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার বাসনায় উন্মাদ করবে না। তাকে পরিবার থেকে বিমুখ করে বহির্মুখী করে তুলবে না। তাকে এমন কোনো পেশা কিংবা পরিবেশে ঠেলে দেবে না, যেখানে তার নারীত্ব ও মর্যাদা মারাত্মকভাবে শোষিত হয়, কিন্তু সেটা সে অনুভবও করতে পারে না। তাকে মাতৃত্বের পরিচয় ছাপিয়ে কেবলই একটা উৎপাদক যন্ত্র হওয়ার লিপ্সায় অন্ধ করে তুলবে না।

ইসলামে নারীশিক্ষা কর্মসূচির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এই কর্মসূচি প্রথমে তাকে আল্লাহর আবদিয়্যাত বাস্তবায়নের চেতনায় উজ্জীবিত করবে। তারপর তাকে একজন আদর্শ পরিবার পরিচালক ও প্রজন্ম তৈরির কারিগর হিসেবে গড়ে তুলবে। সবশেষে তার ফিতরাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ক্ষেত্রগুলোতে সেবা দেওয়ার জন্য তাকে যোগ্য করে তুলবে।

নারীর চাকরি

নারীর চাকরির কথা বলতে গেলে যেই বিষয়টি বুঝতে হবে, আধুনিক যুগের চাকরি কাঠামো সম্পূর্ণই নতুন। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঘরের বাইরে থাকাসহ আরও বিভিন্ন নিয়মনীতি ও বাধ্যবাধকতা পালনের যেই কাঠামো আমরা দেখতে পাই, সেটার সাথে ইসলামের প্রথম যুগের কিছু দৃষ্টান্ত এনে তুলনা করলে ভুল হবে এবং এটা নিজের ও সমাজের সাথে বিশাল প্রতারণা হবে। তখন হয়তো বিচ্ছিন্ন দলিল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারব, কিন্তু এর খারাপ ফলটাকে অনুধাবন করতে পারব না এবং ইসলামের চাহিদাটাও বাস্তবায়ন করতে পারব না।

ইসলাম কখনোই নারীদের ব্যাপকভাবে ঘরের বাইরে কর্মসংস্থানের দিকে ছোটার

আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন, পৃষ্ঠা ১১১

জন্য উৎসাহিত করে না। আবার নিঃশর্তভাবে তার চাকরির পথকে রুদ্ধও করে দেয়নি। যেন সে প্রয়োজনের মুহূর্তে এই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে। ইসলামের ইতিহাসে ব্যাপকভাবে কর্মের প্রতি নারীদের ঝোঁক পরিলক্ষিত হয় না। মূলত এই ঝোঁক এসেছে পশ্চিমা সমাজ থেকে। কারণ পশ্চিমা সমাজে একটা বয়স পার করার পর পুরুষ নারীর অর্থনৈতিক দায় দায়িত্বের বোঝা বহন করতে চায় না। শায়খ মুস্তফা আস সিবায়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার মতে নারীদের কর্মজীবি হওয়ার মাত্রারিক্ত বাসনা নিছক পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া কিছুই না। এই পথ অবলম্বন করার পর নারীকে সেসব কষ্টকর দায়দায়িত্ব বহন করতেই হবে, যা পাশ্চাত্যের নারীকে করতে হয়। আর এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দর্শনের সকল অনিবার্য কুফলগুলোও তাকে ভোগ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।[২৫৬]

আমরা অনেক সময় হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ব্যবসাকে নারীদের চাকরির পক্ষে দলিল হিসেবে দেখাতে চাই। কিন্তু আমরা ভুলে যাই, হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলাম গ্রহণের আগেও নিজে ব্যবসায় সক্রিয় ছিলেন না। সম্ভ্রান্ত ও ধনী ফ্যামিলির হওয়ায় তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে অঢেল সম্পদ লাভ করেন। সেই সম্পদ গোলাম ও কাজের লোকের মাধ্যমে ব্যবসায় খাটান। এটা ছিল ইসলাম গ্রহণ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বের কথা।

রাসুলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তিনি সকল দায়িত্ব রাসুলের কাছে ন্যস্ত করে দেন। রাসুল দীনের স্বার্থে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সম্পদকে কল্যাণকরভাবে ব্যবহার করেন। আর খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার সমস্ত মনোযোগ ও আকর্ষণ রাসুলের প্রতি নিবিষ্ট করেন। হাদিস কিংবা ইতিহাসে এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যাবে না, যার মাধ্যমে বিবাহের পর খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যবসায়িক ব্যস্ততা ও আলাপের কোনো চিত্র প্রমাণ করা যাবে। তা ছাড়া খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যবসার ঘটনা ছিল নবুয়তের পূর্বের ঘটনা। তখনো ইসলামি শরিয়ার বিধান অবতরণ ও তার বাস্তবায়ন শুরু হয়নি। এই ঘটনা শরয়ি বিধানের দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। সুতরাং হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার দৃষ্টান্ত দিয়ে নারীদের ব্যাপকহারে ব্যবসা বা চাকরির দিকে ধাবিত করার প্রচেষ্টা ইসলামি শরিয়াহর সাথে পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক।

২৫৬. আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন, পৃষ্ঠা ১১৬

হ্যাঁ, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এমন আছে, যা মহিলাদের দ্বারা খুবই উপকৃত হতে পারে। যেমন হাসপাতাল, শিশুবিদ্যালয়, মহিলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও এমন সামাজিক কর্মকাণ্ড যেখানে নারীরাই অধিকতর সফলতা লাভ করতে পারে। আবার নারীদের ভেতর এমন কোনো বিরল প্রতিভাধারী মানুষও থাকতে পারে, যাদের মেধা উম্মাহর কল্যাণে বৃহৎ ভূমিকা রাখতে পারে। এসব ক্ষেত্রে নারীর চাকরি করাটা কেবল চাকরিজীবি নারীদেরই প্রয়োজন পূরণ করে না, এর পাশাপাশি তার এই চাকরিটা সামাজিক প্রয়োজন ও দাবি পূরণেও ভূমিকা রাখে।[২৫৭] এইজন্য উলামায়ে কেরাম এসব ক্ষেত্রে কিছু নারীর অংশগ্রহণকে ফরজে কিফায়া হিসেবে মত প্রদান করেছেন। ফলে আমাদের উচিত নারীবান্ধব এসব ক্ষেত্রকে নারীদের জন্য উন্মুক্ত করা। এগুলো বিশাল এক ক্ষেত্র, যেখানে আমরা নারীদের আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা, যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে পারি।

নিজেকে প্রমাণ করার জন্য, কথিত স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত তৈরির জন্য, উইমেন এম্পাওয়ারের (নারীর ক্ষমতায়নের) জন্য কিংবা পুরুষের সাথে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য চাকরির প্রতি বর্তমান নারীসমাজের যেই অবাধ ঝোঁক তৈরি হয়েছে, এর সাথে শরিয়াহর কোন সম্পর্ক নেই। উম্মাহর বৃহৎ কল্যাণ ও সত্যিকার অর্থেই নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য নির্দিষ্ট কিছু নারী কর্মসংস্থানে আসতে পারে এবং সেটাও ইসলামের অন্য সব বিধিবিধানকে অক্ষুণ্ণ রেখে। কিন্তু মুসলিম নারীদের প্রধান জায়গা তার পরিবার। পরিবারকে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য দূর্গ হিসেবে প্রস্তুত করার যেই মহান দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষ উভয়কেই দিয়েছেন, সেই দায়িত্ব পালনে পরিবারই তার আসল ক্যারিয়ার, মূল কর্মক্ষেত্র। এখানে অবহেলা ও ত্রুটি করে এবং আল্লাহর শরিয়াহকে লঙ্ঘন করে মুসলিম নারীদের কোনো ক্যারিয়ার থাকতে পারে না। তৈরি হতে পারে না তাদের সফলতা ও উন্নতির কোনো গল্প।

২৫৭. কর্মক্ষেত্রে নারী, পৃষ্ঠা ২৭, আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন, পৃষ্ঠা ১১৩

নারী-নেতৃত্ব

যদিও ইসলাম নারীকে দীন প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব অর্পণ করেছে, তথাপি ইসলামের প্রথম যুগ থেকে রাজনীতির সাথে তাদের কোনো সংস্রব ছিল না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর বনু সায়িদা গোত্রের মুক্তাঙ্গনে মুসলমানদের খলিফা নির্বাচন-সংক্রান্ত সলাপরামর্শের জন্য সাহাবিদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে কোনো নারী সদস্য যোগদান করেছিল বলে আমাদের জানা নেই। শাসন-সংক্রান্ত কোনো কর্মকাণ্ডে পুরুষদের সাথে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি আমাদের জানা নেই।

খুলাফায়ে রাশেদিন রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলির ব্যাপারে পরামর্শের জন্য পুরুষদের যেমন বৈঠক আহবান করতেন, তেমনি নারীদেরও বৈঠক অনুষ্ঠিত করতেন—এমন কোনো তথ্য আমাদের গোচরে আসেনি। ইসলামের সমগ্র ইতিহাসেও আমরা এমন কোনো নজির দেখতে পাই না যে, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে, রাজনৈতিক তৎপরতায় ও যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনায় নারীরা পুরুষদের পাশাপাশি অবস্থান করত। হ্যাঁ, কোনো কোনো সময় রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যোগ্য নারী আপত্তি জানাত। সেই সুযোগ এখনো আছে। কিন্তু এর দ্বারা কখনো সক্রিয় রাজনৈতিক তৎপরতা প্রমাণিত হয় না।

ইতিহাসে আমরা যেটুকু পাই তা হচ্ছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের হাতে হাত না রেখেই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তারা কখনো আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, সন্তান হত্যা করবে না, কারও নামে মিথ্যা অপবাদ রটাবে না এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ লঙ্ঘন করবে না। কিন্তু এই সব অঙ্গীকারগ্রহণের ঘটনাকে কেউ যদি মুসলিম নারীর রাজনৈতিক তৎপরতা হিসেবে গণ্য করে, তবে সে ভুল করবে এবং একে ইতিহাসের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না।

আমরা জানি যে, কোনো কোনো সাহাবির স্ত্রী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচালিত যুদ্ধবিগ্রহে আহতদের সেবা-শুশ্রূষা ও পিপাসার্তদের পানি পান করানোর জন্য পুরুষদের সাথে রণাঙ্গনে যেতেন। তারা আহতদের চিকিৎসা ও সেবার জন্য নির্ধারিত শিবিরে থাকতেন এবং কোনো মুসলমান যুদ্ধে আহত হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ওই শিবিরে নিয়ে

যাওয়ার নির্দেশ দিতেন। এই তথ্যটাও নারীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার প্রমাণ বহন করে না।

ইতিহাসের এক বিখ্যাত যুদ্ধ জঙ্গে জামালে উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি উটের পিঠে বসে পর্দার অন্তরাল থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, পরবর্তী সময়ে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের এই কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করেছিলেন এবং অন্যান্য উম্মুল মুমিনিনগণ এ জন্য তাকে ভর্ৎসনাও করেছিলেন। কাজেই হযরত আয়েশার এই পদক্ষেপ দ্বারা মুসলিম নারীর রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত হওয়ার বৈধতা প্রমাণ হয় না। কেননা প্রথমত এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, দ্বিতীয়ত এটা যে ভুল ছিল ব্যাপারটা স্বয়ং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাই উপলব্ধি করেছিলেন।[২৫৮]

ইতিহাসের কোনো কোনো যুগে কোনো কোনো নারী দেশের শাসক ও সম্রাজ্ঞী হয়েছিলেন। কেউ বা নিজ স্বামীর প্রভাব খাটিয়ে পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশীদার হয়েছিলেন। সবই ব্যতিক্রমী ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা, যা দলিল প্রদানের জন্য উপযুক্ত না। কারণ ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলি কখনো শরিয়াহর ব্যাপারে দলিল হয় না।[২৫৯]

সুতরাং এ কথা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, মুসলিম নারীরা অতীতে রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করত না এবং মুসলমানদের মধ্যে সংগঠিত রাজনৈতিক ঘটনাবলিতেও তারা প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা রাখত না । হ্যাঁ, সমাজ সংস্কার, ইসলামি দাওয়াহ ও শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রে তারা সামাজিকভাবে অনেক ভূমিকা পালন করেছেন। নারীদের মাঝে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক তৎপরতা তারা পরিচালনা করেছেন এবং এই সুযোগ তাদের এখনো আছে; বরং বলতে হবে মুসলিম নারীদের এসব দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হতে হবে। কিন্তু সক্রিয় রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ইসলাম কখনোই অনুমোদন করে না। এটা

---

২৫৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/১৭৭ পৃষ্ঠা। জঙ্গে জামালের জন্য হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার এত আফসোস ছিল যে, যখন কুরআনে কারিম তিলাওয়াত করতে করতে সুরায়ে আহযাবের নিম্নোক্ত আয়াতে পৌঁছতেন, যেখানে মহান আল্লাহ তাআলা নারীদের এ হুকুম দিয়েছেন, তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করো, তখন তিনি এত কাঁদতেন যে, তার ওড়না পর্যন্ত ভিজে যেত।

২৫৯. আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন, পৃষ্ঠা ১০৩-১০৪

তার যোগ্যতাকে অস্বীকৃতি দানের জন্য নয়; বরং পরিবার ও সমাজ গঠনের দায়িত্বে নিরবিচ্ছিন্নভাবে আত্মনিয়োগ, সার্বিক পর্দারক্ষা, ফ্রি-মিক্সিং এড়িয়ে চলা, মাহরাম ছাড়া সফর না করাসহ ইসলাম তাকে যেসব মূল্যবান বিধিনিষেধ দিয়েছে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি নিশ্চিতভাবে তার এসব বিধান পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। এজন্য যুগে যুগে মুসলিম নারীরা রাজনৈতিক হাঙ্গামা থেকে নিজেদের গুটিয়ে রেখেছেন।

আর এটা নারীর প্রতি অবমূল্যায়ন কিংবা নারীর অধিকার লঙ্ঘন করাও নয়; বরং ইসলাম এর মাধ্যমে নারীর ওপর অনুগ্রহ করেছে এবং তাকে বাহ্যমান রাজনীতির দৃশ্য থেকে আড়ালে রেখে যোগ্য ব্যক্তিত্ব গঠন করে নিজের ক্ষমতা বাস্তবায়নের সুযোগ দিয়েছে। তাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে তার মৌলিক দায়িত্ব পালনের নিরাপদ ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

পরিশেষে মুসলিম নারীদের তাদের রবের প্রতি বিশ্বাস মজবুত করতে হবে। মহান আল্লাহ তাআলা কারও ওপর জুলুম করেন না। তিনি নারীদের ওপরও জুলুম করেননি। আমাদের অধিকারের কনসেপ্ট বিদেশি কোনো সংস্থা কিংবা দেশীয় কোনো এনজিওর কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে না। আমাদের অধিকারের উৎস মহান রবের দেওয়া পবিত্র শরিয়াহ, যিনি আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। সেই উৎস থেকেই আমরা আমাদের অধিকারের কনসেপ্ট গ্রহণ করব। কোনো সংস্থা কিংবা প্রচারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়; বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের মানসিকতা নিয়ে।

পরিশিষ্ট : ৩

এই পরিশিষ্টটি জাতিসংঘ কর্তৃক পরিবার পরিকল্পনা প্রজেক্টের প্রকৃত চেহারা তুলে ধরার জন্য যুক্ত করা হচ্ছে। পূর্বেও বলেছি এবং আমরা এখানেও শুরুতে বলে নিচ্ছি, জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার পেছনে জাতিসংঘসহ পশ্চিমা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যেসব যুক্তি পেশ করে, তার সবগুলোই অবান্তর। জনসংখ্যা থেকে সৃষ্ট হিসেবে যেসব সমস্যাকে তারা সামনে আনছে, সেগুলো আসলে জনসংখ্যা থেকে সৃষ্ট না; বরং এগুলোর সম্পর্ক তাদেরই কৃতকর্মের সাথে। পৃথিবীর সম্পদের ওপর পুঁজিবাদীদের অবৈধ ও কুক্ষিগত নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজে সম্পদের অসম বণ্টনের ফলে জনগোষ্ঠী তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অধিকন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহারের ফলে নারীরা অনেক সময় বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় পড়ছে। এমনকি এগুলো নারীর মানসিক ও যৌন স্বাস্থ্যের ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলে।[২৬০]

জনসংখ্যা কম হলেই যে একটা দেশের মানুষ সুখে থাকবে তা মোটেও সত্য নয়। বর্তমান দুর্ভিক্ষকবলিত এলাকাগুলোর তালিকা করলে সোমালিয়ার নাম প্রথম দিকেই থাকবে। অথচ সোমালিয়ার আয়তন ৬ লাখ ৩৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার, যা বাংলাদেশের ৪ গুণেরও বেশি। আর জনসংখ্যা মাত্র ১ কোটি, যা বাংলাদেশের ১৬ ভাগের ১ ভাগ। তথাপি সোমালিয়া অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের চেয়ে অনেকটা নিম্নগামী।

---

২৬০. ইসলাম ও যুক্তির কষ্টিপাথরে জন্মনিয়ন্ত্রণ, ৬৩ পৃষ্ঠা

মহান আল্লাহ তাআলা এই জগতের কারিগর। তিনি মানুষের সাধারণ জন্মদানক্ষমতার হারেই প্রকৃতিকে প্রস্তুত করে তোলেন। আগের থেকে পৃথিবীর উৎপাদন বেড়েছে, অনাবাদি ও পরিত্যক্ত জায়গা আবাদ হচ্ছে, এমনকি পৃথিবীতে নতুন আবাসস্থলেরও আবিষ্কার হয়েছে। আমেরিকা আবিষ্কারের আগে কে জানত যে, এরকম একটি ভূমি মানুষের বসবাসে ভরপুর হয়ে উঠবে। সুতরাং এই সবকিছুই আল্লাহর পরিচালনাধীন। তিনি বলেন, 'আমার কাছে প্রতিটি বস্তুর ভান্ডার আছে। আমি এর থেকে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে রিজিক অবতীর্ণ করি।'[২৬১]

এজন্য মানুষের জন্ম ঠেকানোর আন্তর্জাতিক আয়োজন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর জগৎ পরিচালনায় হস্তক্ষেপের নামান্তর। আমাদের দায়িত্ব প্রকৃতির সম্পদকে সুষম বণ্টন ও যথাযথভাবে ব্যবহার করা। আল্লামা তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ এই বিষয়ে খুব সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। মনে করুন আপনি একটি ছোট ঘর বানিয়েছেন। ঘরটি এত নিচু যে, আপনি ঘরের ভেতর সোজা হয়ে ঢুকলে আপনার মাথা ঘরের চাল কিংবা ছাদে গিয়ে ঠেকে। এমতাবস্থায় আপনি ঘরের ভেতর সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সুবিধার্থে আপনার পা দুটি কেটে নিজেকে ছোট করে ফেলা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? নাকি ঘরের চালটা আরেকটু উঁচু করতে হবে? কোনো বিবেকবান ব্যক্তিই কিন্তু পা কাটার পক্ষে সায় দেবেন না। তেমনি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রবক্তারাও সীমিত সম্পদের সুষম উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা না করে আল্লাহর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ মানব সন্তানের জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করে সাম্যতার বিধান করতে চায়। এটি কত বড় নির্বুদ্ধিতা ও হাস্যকর বিষয়।[২৬২]

মূলত বিগত শতাব্দীতে পরিবার পরিকল্পনা নামে যেই প্রজেক্ট বিশ্বজুড়ে ছড়িয়েছে, এটির সাথে পরিপূর্ণভাবে পশ্চিমা রাজনীতির উদ্দেশ্যমূলক সম্পর্ক আছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে ১৮ শ শতাব্দীতেও টমাস ম্যালথাস জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আওয়াজ তুলেছিল। তবে তার প্রস্তাবনার প্রেক্ষাপটের ধরন আজকের জন্মনিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। বলা যায় ১৯৭৪ সালে হেনরি কেসিঞ্জার এই প্রকল্পের মাঝে একটি নতুন রূপদান করে এবং বিশ্বব্যাপী একটি পলিসি হিসেবে পরিবার পরিকল্পনাকে ছড়ানোর ব্যবস্থা করে। ১৯৭৪ সালে তার নির্দেশনায় USNSC

---

২৬১. সুরা হিজর, আয়াত ২১

২৬২. ইসলাম ও যুক্তির কষ্টিপাথরে জন্মনিয়ন্ত্রণ, পৃষ্ঠা

এর অধীনে একটি পলিসি হিসেবে রিপোর্টটি তৈরি করা হয়। রিপোর্টির নাম হচ্ছে, National security study memorandum ২০০ (NSSM ২০০)। আমেরিকান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পলিসি হিসেবে রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে এবং পুরো রিপোর্টে আমেরিকার স্বার্থকেই সামনে রাখা হয়েছে।

এই রিপোর্টে তারা আলোকপাত করেছে, কীভাবে অনুন্নত দেশগুলোর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের জনশক্তিকে দমিয়ে রাখা যায় এবং সেই সুযোগে তাদের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ থেকে কীভাবে আমেরিকার অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা যায়। এবং এইজন্য তারা ইউনাইটেড ন্যাশন, ইউএসএআইডি, ইউএসআইএ এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। পাশাপাশি সেসব দেশের সরকারকেও এই ব্যাপারে নিজ থেকে উদ্যোগী করে তোলার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্রের ভীতি তৈরির পাশাপাশি তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহের বিস্তার, গর্ভপাতকে স্বাভাবিককরণ এবং নারীদের বিয়েকে বিলম্বকরণসহ তাদের শিক্ষাকার্যক্রমকে দীর্ঘায়িত করে কর্মসংস্থানে নিয়ে আসাকে পলিসি হিসেবে গ্রহণ করে। কারণ এতে প্রথমত নারীদের মাঝে নিজ থেকেই পরিবার ও সন্তান গ্রহণের ব্যাপারে অনীহা তৈরি হবে, দ্বিতীয়ত বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের বাচ্চাদান ক্ষমতাও হ্রাস পেতে থাকবে। যদিও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলে মেয়েদের উপযুক্ত বয়সে বাচ্চা না নেওয়ার একটি মিথ উদ্দেশ্যমূলকভাবে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সত্য হলো, ৩০ বছরের আগ পর্যন্ত সন্তান জন্মদানের সবচেয়ে সফল ও কার্যকর সময় থাকে। ৩০ এর পর মা হওয়ার জটিলতা বাড়তে থাকে। এই সময় থেকে ডিম্বাণুর সংখ্যা ও গুণগতমান হ্রাস পেতে থাকে। অথচ শিক্ষা, ক্যারিয়ারের পেছনে পড়ে বর্তমান সমাজের অধিকাংশ মেয়ে বিয়েই করছে ৩০ এর কাছাকাছি গিয়ে। যার দরুন বর্তমান অধিকাংশ নারীদের বাচ্চাদান ক্ষমতা কমে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ১৯৫০ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে একজন নারীর সন্তান জন্মদানের হার সবচেয়ে বেশি ছিল ১৯৬৮ সালে। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে এই হার কমতে থাকে। ক্রমাগত এই হ্রাস ২০২১ সালে এসে জনপ্রতি ১.৯৭৯ এসে দাঁড়ায়, যা ২০২০ এ ২.০০৩ এ ছিল।[২৬৩]

...://www.macrotrends.net/countries/BGD/bangladesh/fertility-rate

পাশের দেশ ভারতে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রকল্প একরোখাভাবে মুসলিমদের ওপর দমননীতি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আরএসএস, বজরং ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো দলগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের জিগির তুলেছে। তারা সেটাকে 'পপুলেশন জিহাদ' বলে আখ্যায়িত করছে। এজন্য তারা মুসলিম এলাকাগুলোতে দুই সন্তানের অধিক সন্তান নেওয়া যাবে না মর্মে আইন প্রণয়ন করছে। কিন্তু হিন্দুদের বেশি বেশি সন্তান নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে।[২৬৪] যারা জনসংখ্যা বিস্ফোরণের দোহাই দিয়ে মুসলিম জনসংখ্যাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য তৎপর, সেসব হিন্দুত্ববাদী নেতাদের কারও কারও তিন থেকে পাঁচ এর অধিক সন্তান আছে।[২৬৫]

জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ইসলামাইজেশন করার জন্য মুসলিমদের ভেতর একটি দল প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। তাদের কাছে যখন সন্তান হত্যা নিষেধাজ্ঞা সংবলিত আয়াত পড়া হয়, তখন তারা সন্তান হত্যা ও জন্মনিয়ন্ত্রণের মাঝে পার্থক্য তুলে ধরেন। তারা বলেন, আয়াতে তো সন্তান হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, জন্মনিয়ন্ত্রণকে নয়। অথচ এটি মারাত্মক ভুল। কুরআনুল কারীমে 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না'-এর ওপর কথা সমাপ্ত করেনি; বরং এই অংশের পরেও আরও কথা আছে। সেটা হলো দরিদ্রতার ভয়ে, এরপর সামনে গিয়ে তিনি এর কারণও উল্লেখ করে দিয়েছেন যে, আমি (আল্লাহ) তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করি এবং তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থাও করি।[২৬৬]

যারা এই আয়াত থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণের নিষেধাজ্ঞা খুঁজে পান না, তাদের অবস্থা মূলত ওই ব্যক্তিদের মতো, যারা সুরা নিসার ৪৩ নং আয়াত দিয়ে নামাজ থেকে দূরে থাকার কথা বলেন। এই আয়াতের প্রথম অংশে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তোমরা নামাজের কাছে যেয়ো না'। এখন কেউ যদি পরবর্তী অংশ খেয়াল না করে বলে যে, আল্লাহ তাআলা সর্বাবস্থায় নামাজের কাছে না যেতে বলেছেন, তখন কি তার দাবি ঠিক হবে? অথচ আয়াতের পরের অংশেই আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে, অচেতন-মাতাল অবস্থায় যেন আমরা নামাজে না দাঁড়াই।

---

২৬৪ . https://www.thehindu.com/news/national/other-states/Produce-more-children-RSS-tells-Hindu-couples/article14582028.ece

২৬৫ . https://www.ndtv.com/india-news/population-control-madhya-pradesh-bjp-leaders-want-up-like-population-control-law-2490093

২৬৬ . সুরা ইসরা, আয়াত ৩১

এ ছাড়াও আযল[২৬৭] করার অনুমতি-সংক্রান্ত কিছু হাদিস দিয়ে বর্তমান জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রজেক্টকে তারা বৈধ করতে চায়। অথচ এর বিপরীত হাদিসও আছে। দুই প্রকার হাদিস থেকে ফুকাহায়ে কেরাম বিশ্লেষণ করে যেই গবেষণালব্ধ ফলাফল বের করেছেন, সেটা জন্মনিয়ন্ত্রণ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। যার থেকে স্পষ্ট যে, নির্দিষ্ট ওজর ও সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি জায়েয আছে। তবে সেটাও হতে হবে অসৎ উদ্দেশ্যবিহীন। তাই বলে এই পদ্ধতির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যাপক প্রসার ঘটানো ইসলাম-পরিপন্থি কাজ। আর এই পদ্ধতি অবলম্বন করাকে দেশ ও জাতির উন্নতি-অগ্রগতির সোপান আখ্যায়িত করা, যেটাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকারক ও অপছন্দ করেছেন, তা কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। [২৬৮]

বর্তমান জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রজেক্টকে এককভাবে দেখলে ভুল হবে। এই প্রজেক্টের ভেতর একই সাথে নারীর কর্মজীবি হওয়ার বাসনা, পরিবার ও সন্তান জন্মদানের প্রতি অনাগ্রহ এবং তার বিয়েকে ক্যারিয়ারের পেছনে পড়ে বিলম্বকরণের মতো সমাজ বিধ্বংসী আরও অনেক ফ্যাক্ট জড়িত। মূলত মুসলিম নারীদের নিয়ে পশ্চিম বিশ্ব ও আধুনিক প্রাচ্যবাদের যেই পরিকল্পনা রয়েছে, সেই পরিকল্পনার প্রতিটি অংশ একে অপরের সাথে জড়িত।

আমরা যদি সৃষ্টিগতভাবে নারীদেহের গঠন ও তার ভাবাবেগ ইত্যাদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখব মাতৃত্ব একজন নারীর স্বভাবজাত কামনা-বাসনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার ফিতরাত নষ্ট না হয়ে গেলে কখনো সে এর প্রতি অনাগ্রহী হতে পারে না। তার শরীরের সকল আয়োজন যেন মানব সভ্যতাকে বিকাশপূর্বক টিকিয়ে রাখার জন্য। তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এই

---

২৬৭. আযল বলা হয়, স্বামী-স্ত্রী যৌন মিলনের পর চরম উত্তেজনার সময় বীর্য নারীর লজ্জাস্থানের বাইরে নির্গত করা।

২৬৮. ইসলাম ও যুক্তির কষ্টিপাথরে জন্মনিয়ন্ত্রণ, পৃষ্ঠা ২৪; জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মৌলিকভাবে ইসলাম ও বাস্তবতার অবস্থান জানতে বাংলা ভাষায় এই বইটি একটি চমৎকার কাজ। মূল লেখক আল্লামা তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ, অনুবাদক মাওলানা ফাহিম সিদ্দিকি, প্রকাশনায় আহবান প্রকাশনী। এ ছাড়াও মুফতি দেলোয়ার হুসাইন হাফিজাহুল্লাহ তাঁর ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা [illegible] বিষয়ে ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন এবং বৈধতাদাতাদের [illegible] সে বইটিও দেখতে পারেন।

মহান দায়িত্বভারের জন্য ব্যাকুল থাকে। আমাদের নারীদের এই ব্যাকুলতাকে গভীর মমতার সাথে অনুভব করতে হবে। বহির্গত কোনো কিছু যেন তার এই ব্যাকুলতাকে নষ্ট করতে না পারে। এই ব্যাকুলতাকে লালনপালন করে পুরো জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না, এই ব্যাকুলতা তার মহান রবের দেওয়া আমানত। এটাকে পবিত্র রাখতে হবে। রবের দেওয়া দায়িত্ব অনুযায়ীই এই ব্যাকুলতাকে কাজে লাগাতে হবে।